ISSN 1813-0372

বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৩৯
জুলাই - সেপ্টেম্বর : ২০১৪

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৩৯

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১৪

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
web : www.ilrcbd.org

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
MSA 11051
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:
পুরানা পল্টন শাখা, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ : ল' রিসার্চ সেন্টার

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স
দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US$ 5

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়..৪

ইসলামী আইনে 'আযীমাত ও রুখসাত : একটি পর্যালোচনা..............................৭
ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক

আবাসগৃহে প্রবেশাধিকার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ ৩৩
ড. আহমদ আলী

মানবতার কল্যাণে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা ৬৩
মোঃ তৌহিদুল ইসলাম

আল-ফিকহুল মুকারান-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
(হিজরী ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত) : একটি গ্রন্থভিত্তিক সমীক্ষা ৯৭
শাহাদাৎ হুসাইন খান

খলীফা উসমান রা.-এর বিচারব্যবস্থা ও ফিকহী
ইজতিহাদ : একটি পর্যালোচনা ১১৯
রাশীদাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সম্পাদকীয়

মানবসভ্যতার সূচনা লগ্নে মানুষের যে পরিমাণ দৈহিক শক্তি ও মানসিক সামর্থ ছিল কালক্রমে তা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র মতে আদম আ.-এর উচ্চতা ছিল ষাটগজ। আদম আ.-এর পর অন্যান্য নবী-রসূল ও তাঁদের উম্মতের দৈহিক গঠন, শারীরিক সামর্থ্য বর্তমান যুগের মানুষের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। তারা ছিলেন আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। ধীরে ধীরে মহান আল্লাহ বিভিন্ন নবী-রসূল-এর মাধ্যমে সভ্যতার উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। যেমনটি আমরা ইতিহাসগ্রন্থ পাঠে জানতে পারি।

আদি মানুষের শক্তি সামর্থ্য যেমন বর্তমান মানুষের তুলনায় বেশী ছিল তেমন তাদের ওপর আরোপিত শরীয়তের অনেক বিধানও ছিল উম্মতে মুহাম্মাদীর তুলনায় কঠোর ও কঠিন। পূর্বেকার নবীদের উম্মাহ্‌র তুলনায় শেষনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ স.-এর উম্মাহ্‌র ওপর আরোপিত শরীয়তের বিধানাবলি অপেক্ষাকৃত সহজ, কঠোরতামুক্ত ও বাস্তবায়নযোগ্য। আল্লাহ তাআলা শেষ যামানার উম্মতের ধারণক্ষমতা ও সহনশীলতা বিবেচনা করেই শরীয়তের পালনীয় ও বর্জনীয় বিধান আরোপ করেছেন। আরোপিত বিধানকেও আবার বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত করেছেন। আযীমাতের পাশাপাশি রুখসাতের সুযোগ রাখার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্যে শরীয়তের বিধান সহজসাধ্য করে দেয়া হয়েছে। যাতে কোন মুসলিমকে কঠিন কোন মুহূর্তে শরীয়তের গণ্ডি বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে না হয়। 'ইসলামী আইন ও বিচার'-এর ৩৯তম সংখ্যায় "ইসলামী আইনে আযীমাত ও রুখসাত" শীর্ষক প্রবন্ধে আযীমাত ও রুখসাতের বিধানকে বহু উদাহরণ ও নযীর উল্লেখ করে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

মানবসভ্যতার অন্যতম অনুষঙ্গ নিরাপদ আবাসস্থল। সভ্য মানুষ মাত্রই নির্ঝঞ্ঝাট আবাসিক সুবিধা পেতে আগ্রহী। নিজের আবাসগৃহে অনাকাঙ্ক্ষিত কারো অনুপ্রবেশ রোধে তাই সবাই সোচ্চার। কিন্তু অনেক সময় এক্ষেত্রে প্রত্যাশার ব্যত্যয় ঘটে। অনাকাঙ্ক্ষিত অনুপ্রবেশের কারণে নানাবিধ বিপত্তি ঘটে। ইসলাম গণমানুষের আবাসস্থলকে নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত করার জন্যে প্রবেশাধিকার প্রশ্নে সুনির্দিষ্ট বিধি-

নিষেধ আরোপ করেছে। এগুলো যে কোন মানুষ মেনে চললে আবাসস্থলের নিরাপত্তাই শুধু সুরক্ষিত হবেনা, বহু অনৈতিক ও চারিত্রিক বিপর্যয় থেকেও নিরাপদ থাকা যাবে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের আবাসন আইন ইসলামী আইনের আলোকে ঢেলে সাজালে অনৈতিকতার রাহুগ্রাস থেকে যেমন রক্ষা পাওয়া যাবে তদ্রুপ আবাসিক আইন-শৃংখলা ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও সুফল পাওয়া যাবে। তা ছাড়া ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রত্যেক নাগরিক যদি "আবাসগৃহে প্রবেশাধিকার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ" শীর্ষক প্রবন্ধটিতে আলোচিত বিধানগুলো মেনে চলেন তবে অনেক সামাজিক অনাচার থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

মানবজীবনে অর্থ-সম্পদ অপরিহার্য উপাদান। আর ব্যাংকব্যবস্থা আধুনিক সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। "সুদী অর্থব্যবস্থা মানবসভ্যতার জন্যে ক্ষতিকর" এটি এখন আর কোন তাত্ত্বিক বক্তব্য নয়; পরীক্ষিত বাস্তবতা। যে বাস্তবতার কথা পবিত্র কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাবে প্রায় পনেরোশ বছর পূর্বেই ঘোষণা করেছে। সুদী অর্থনীতি ও ব্যাংকব্যবস্থার নানা ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়ে বর্তমান বিশ্বের বহু নন্দিত অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকার একথা বলিষ্ঠভাবে উচ্চারণ করছেন যে, "সুদী ব্যাংকব্যবস্থার বিপরীতে সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থা গণমানুষের জন্যে বেশী কল্যাণকর এবং টেকসই"।

সাম্প্রতিক বিশ্ব অর্থনৈতিক ধস এবং বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের ব্যাংকিং-এর বিপর্যয়ে ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আরো প্রকট হয়ে ওঠেছে। সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও ইসলামী ব্যাংকিং এখন দ্রুত অগ্রসরমান। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল নাগরিকদের জন্যেই ইসলামী ব্যাংকিং কল্যাণজনক; এটি প্রমাণিত সত্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের এ ক্ষেত্রে আরো অনেক করণীয় রয়ে গেছে। সেই সাথে রয়ে গেছে আইনী জটিলতা। "মানবতার কল্যাণে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা" শীর্ষক প্রবন্ধটিতে ইসলামী ব্যাংকিং-এর উপকারিতা ও কল্যাণের দিকটি নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ব্যাংকিং জগতের সকল ব্যক্তি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জানতে আগ্রহী সকলের জন্যেই রয়েছে পর্যাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত। আশা করি এই প্রবন্ধটি অনেকের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

ইসলামী শরীয়ত অত্যন্ত উদার ও সাবলিল। কুরআন ও সুন্নাহ-এর সুস্পষ্ট অলঙ্ঘনীয় বিধানগুলোর বাইরে সামগ্রিক ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের নানা বিষয়ে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিধানের তারতম্য ঘটে। আর এই উদারতা ও ব্যাপকতার বিষয়টিকে কেন্দ্র

করে ইসলামী শরীয়তে গড়ে ওঠেছে বিভিন্ন মাযহাব ও চিন্তকগোষ্ঠী। আর এই বিভিন্ন চিন্তকগোষ্ঠীর চিন্তার ভিন্নতা কালক্রমে একটি শাস্ত্রে উন্নীত হয়েছে। আধুনিক যুগে "আল-ফিকহুল মুকারান" বা "তুলনামূলক ফিক্‌হ" বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ একাডেমিক বিষয়। "আল-ফিকহুল মুকারান"-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (হিজরী ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত) : একটি গ্রন্থভিত্তিক সমীক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধটি আগ্রহী পাঠক গবেষকদের কাছে সময়োচিত একটি আলোচনা হিসেবে আদৃত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

কুরআন ও সুন্নাহ্‌র-এর পাশাপাশি খুলাফায়ে রাশিদীন-এর কথা ও কর্মও প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অনুসরণীয়। তৃতীয় খলীফা উসমান রা.-এর খিলাফাতকাল বিভিন্ন কারণে আলোচিত হলেও তাঁর বিচার ও ইজতিহাদ সম্পর্কে বাংলা ভাষায় চর্চা খুব কম। অথচ তাঁর বিচারিক নযীর ও ফিকহী ইজতিহাদ আধুনিক কল্যাণরাষ্ট্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। "খলীফা উসমান রা.-এর বিচারব্যবস্থা ও ফিকহী ইজতিহাদ : একটি পর্যালোচনা" প্রবন্ধে লেখিকা নির্ভরযোগ্য ইতিহাস থেকে সংশ্লিষ্ট কিছু তথ্য তুলে এনেছেন। এ প্রবন্ধ উসমান রা.-এর খিলাফাতকালের বিচার ব্যবস্থা ও তাঁর ইজতিহাদ সম্পর্কে ধারণা দিবে।

ত্রৈমাসিক "ইসলামী আইন ও বিচার" বাংলাভাষায় একমাত্র গবেষণা জার্নাল যা ইতঃমধ্যে সকল মহলের বিশেষ করে একাডেমিক গবেষক ও পেশাজীবীদের মধ্যে ইসলামী আইন সম্পর্কে যে নিত্য নতুন গবেষণার সুযোগ ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এ ব্যাপারে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। দেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদগণও "ইসলামী আইন ও বিচার" জার্নাল সম্পর্কে সপ্রশংস মতামত ব্যক্ত করছেন। উনচল্লিশতম সংখ্যায় প্রকাশিত সব কয়টি প্রবন্ধও অন্যান্য সংখ্যার মতো পাঠকমহলে আদৃত হবে বলেই আমাদের প্রত্যাশা। মহান আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের সুন্দর ও মানবকল্যাণের দিকগুলো গবেষণার মাধ্যমে সকল মানুষের কাছে উপস্থাপন করার তাওফিক দিন, এই কামনা।

– ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৩৯
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১৪

ইসলামী আইনে 'আযীমাত ও রুখসাত : একটি পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক*

[**সারসংক্ষেপ :** *মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও মানুষের জ্ঞান সীমিত। তাই মানুষ কখনো জ্ঞাতসারে, আবার কখনো অজ্ঞাতসারে আল্লাহর অবাধ্যতায় জড়িয়ে পড়ে। সর্বজনীন আদর্শ হিসেবে ইসলামে যেমন বাড়াবাড়ির অবকাশ নেই, তেমনি শৈথিল্য প্রদর্শনেরও সুযোগ নেই। কাজেই সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মহান আল্লাহ মানুষের সক্ষমতা ও অক্ষমতার ব্যাপারে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হওয়ায় অপেক্ষাকৃত কঠোর বিধান নাযিল করলেও পরবর্তীতে নমনীয় বিধান নাযিল করেন, যাতে মানুষ তাঁর নির্দেশ পালনে অপারগ হয়ে না পড়ে। তাই ইসলামী আইনে মানুষের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক অবস্থাকে পূর্ণ বিবেচনায় রাখা হয়েছে। ফিকহ্ ও উসূলে ফিকহ্ শাস্ত্রের পরিভাষায় একেই বলা হয় 'আযীমাত ও রুখসাত। ইসলামী আইনে এ পরিভাষা দুটোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। প্রবন্ধটি প্রণয়নে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস ছাড়াও ইসলামী আইনের অন্যান্য উৎসের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। এ গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে অত্র প্রবন্ধে 'আযীমাত ও রুখসাতের পরিচয়, শ্রেণিবিভাগ, বিধান, রুখসাতের কারণ ও প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে।*]

'আযীমাত (العزيمة)-এর পরিচয়

'আযীমাত-এর আভিধানিক অর্থ

'আযীমাত (العزيمة) শব্দটি আরবী। এর মূলধাতু ع – ز – م। আভিধানিক অর্থ সংকল্প, সিদ্ধান্ত, শরীয়তের আবশ্যিক বিধান ইত্যাদি, যা মহান আল্লাহ্ স্বীয় বান্দার উপর ফরয করেছেন। বহুবচনে 'আযাইম (العزائم) ব্যবহৃত হয়।[১] এছাড়াও 'আযীমাত শব্দটি নিম্নোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়: Determination, firm will, firm intention, resolution, decision, incantation, spell ।[২] আল-'আযীমাহ্

---

* সহযোগী অধ্যাপক, সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫।

১. আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *আরবী-বাংলা অভিধান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬, বর্ণ 'আইন', পৃ. ৩৬০

২. Hans Wehr, *A Dictionary of Modern written Arabic* 'Arabic English, London : Macdonald and Evans Ltd. 1974, p .611

শব্দটি কোনো কাজ সম্পাদন করার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়, عزمت الامر وعزمت عليه و اعتزمت 'আমি কাজ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, আমি দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছি'।

মহান আল্লাহর বাণী:

﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ﴾

অতঃপর তুমি কোনো সংকল্প করলে আল্লাহর উপর নির্ভর করবে।[৩]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন:

﴿ وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَـٰبُ أَجَلَهُۥ﴾

নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ কার্য সম্পন্ন করার সংকল্প করো না।[৪]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا﴾

আমি তো ইতঃপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল; কাজেই আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাইনি।[৫]

'আযীমাত-এর পারিভাষিক অর্থ

আল্লামা আস-সারাখসী রহ. বলেন,

العزيمة في أحكام الشرع ما هو مشروع منها ابتداء من غير أن يكون متصلا بعارض.

শরী'আতের যে সব বিধান শুরুতেই কোনোরূপ বাধা-বিপত্তির সম্পর্ক ছাড়াই প্রবর্তন করা হয়েছে, তা-ই 'আযীমাত।[৬]

ইমাম আশ-শাতিবী র. বলেন,

العزيمة ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء.

শুরু থেকেই যে সকল সর্বাত্মক বিধান প্রবর্তন করা হয়, তা-ই 'আযীমাত।[৭]

উল্লেখ্য যে, এখানে 'সর্বাত্মক বিধান' বলতে এমন বিধানকে বোঝানো হয়েছে, যা কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সুনির্দিষ্ট নয়; বরং সকল মানুষের জন্য সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য। যেমন- সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হজ্জ ইত্যাদি।

---

৩. আল-কুরআন, ৩ : ১৫৯

৪. আল-কুরআন, ২ : ২৩৫

৫. আল-কুরআন, ২০ : ১১৫; আর-রাগিব আল-ইসফাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, বৈরূত : দারুল মারিফাহ, ২০০৫, পৃ. ৩৩৬-৭

৬. আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আস-সারাখসী, *উসূলুস সারখসী*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৩, খ. ১, পৃ. ১১৭

৭. ইমাম আশ-শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত ফী উসূলিশ শারীআহ্*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ২২৩

'আযীমাত-এর শ্রেণিবিভাগ

মহান আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য মূলত দু'ভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে। একটি হলো, শরীয়ত নির্দেশিত আদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এবং অপরটি হলো নিষেধকৃত বিষয় বর্জনের মাধ্যমে। এ হিসেবে 'আযীমাত দু'প্রকার। যথা-

১. 'নির্দেশিত এমন সব কাজ যা আমল করতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির (মুকাল্লাফ) কোনো প্রকার বেগ পেতে হয় না; বরং সে তা স্বাভাবিকভাবে সম্পাদন করতে পারে। যেমন মুকীম ও সুস্থ অবস্থায় রমযানের সিয়াম রমযান মাসেই রাখা। উল্লেখ্য যে, অসুস্থতা বা সফরের ওযর না থাকা অবস্থায় রমযানের সিয়াম রমযান মাসে রাখার বিধান দিয়েই সিয়াম ফরয করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে সিয়াম রাখে।[৮]

২. শরীয়ত কর্তৃক নিষেধকৃত ও বর্জনীয় এমন সব কাজ, যা ত্যাগ করতে বান্দার কোনো প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। যেমন : কাউকে কুফরী করতে বাধ্য না করা অবস্থায় কুফরী বর্জন করা এবং ক্ষুধার তীব্রতা ও নিরুপায় অবস্থা ব্যতীত মৃত প্রাণির গোশত খাওয়া থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, স্বাভাবিক অবস্থায় কুফরী করা কিংবা মৃত প্রাণির গোশত খাওয়া হালাল নয়।[৯]

মহান আল্লাহ কুফরীর ব্যাপারে বলেন :

﴿فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾

কিন্তু এরপর তোমাদের মধ্যে কেউ কুফরী করলে তাকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাউকে দিব না।[১০]

অপর এক আয়াতে উল্লেখ আছে:

﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার কর্ম নিস্ফল হবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[১১]

ইমাম শাফিঈ রহ. ও তাঁর অনুসারীদের মতে, ঋতুমতী ও প্রসূতি মহিলার ক্ষেত্রে নামায আদায় না করার বিধানটি 'আযীমাতের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম নববী রহ. যুক্তি প্রদান করে বলেন, শরী'আতে যেহেতু তাদেরকে নামায না পড়ার নির্দেশ দেয়া

---

৮. আল-কুরআন, ২ : ১৮৪

৯. আবদুল আযীয আল-বুখারী, *কাশফুল আসরার*, করাচী : সাদাফ পাবলিশার্স, তা. বি., খ. ২, পৃ. ৩০০

১০. আল-কুরআন, ৫ : ১১৫

১১. আল-কুরআন, ৫ : ৫

হয়েছে, তাই তা তাদের জন্য আযীমত। এতদ্ব্যতীত আরো বলা যায় যে, কাউকে কোনো কাজ না করার নির্দেশ দেয়ার পরে একই কাজ আবার তাকে করার নির্দেশ দেয়া কোনোভাবে সমীচীন নয়। [১২]

'আযীমাত-এর বিধান

শরী'আত যার ওপর কোনো কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছে এমন প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির যে কোনো কাজই 'আযীমাত কিংবা রুখসাতের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই সে হয়ত বাধা-বিপত্তি ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে কোনো কাজ সম্পাদন করবে অথবা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের মুখাপেক্ষী হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথমটি হবে 'আযীমাত এবং দ্বিতীয়টি হবে রুখসাত।[১৩] উবায়দুল্লাহ ইবন মাসউদ রহ. বলেন, "প্রকৃতপক্ষে 'আযীমাত শরীআতের প্রত্যেকটি বিধান তথা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল, মুবাহ, হারাম, মাকরূহ ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করে।"[১৪] কোনো কোনো উসূলবিদ উপরিউক্ত শরঈ দায়িত্বমূলক বিধানসমূহ পাঁচটি বিধানের মধ্যে সীমিত রেখেছেন। তা হলোঃ ফরয/ওয়াজিব, মানদূব (মুস্তাহাব), হারাম, মাকরূহ ও মুবাহ।

এ সকল উসূলবিদের মতে, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যে কাজ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা মূলত দুই ধরনের। হয়ত তাকে কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সম্পাদন করতে বলা হয়েছে অথবা স্বাভাবিকভাবে করতে বলা হয়েছে। এমতাবস্থায় যদি অতীব গুরুত্বের সাথে কাজটি সম্পাদন করতে বলা হয়ে থাকে, তবে তা ফরয বা ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে, অন্যথায় মানদূব। অনুরূপভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যে কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে তাও দুই ধরনের। হয়ত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তা সম্পাদন না করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে অথবা স্বাভাবিকভাবে নিষেধ করা হয়েছে। যদি গুরুত্বের সাথে নিষেধ করা হয়ে থাকে তবে তা হারাম হবে, অন্যথায় তা মাকরূহ। পক্ষান্তরে যে কাজ করা বা না করার ব্যাপারে শরীয়ত স্বাধীনতা দিয়েছে তা হলো মুবাহ। [১৫]

রুখসাত (الرخصة) এর পরিচয়

রুখসাত-এর আভিধানিক অর্থ

রুখসাত শব্দটি আরবী। এটি আরবদের উক্তি : رخص له في الامر থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এর অর্থ "কোনো বিষয়ে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়া এবং সেই কাজ করার অনুমতি প্রদান করা"। এটি মহান আল্লাহ কর্তৃক তাঁর বান্দার জন্য কোনো বিধান

---

১২. ইমাম আল-যারকাশী, *আল-বাহরুল মুহীত*, তা.বি., খ. ১, পৃ. ৪০৫

১৩. ইমাম ফখরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন উমর আর-রাযী, *আল- মাহসূল ফী উসূলিল ফিকহ্*, বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ্, ১৯৯২, খ .১, পৃ. ১২০

১৪. উবায়দুল্লাহ ইবন মাসউদ, শারহুত-*তালবীহ আলাত-তাওদীহ*, তা.বি., খ. ৩, পৃ. ৩৮০

১৫. সাইফুদ্দীন আবুল হাসান আলী আল-আমিদী, *আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ,তা. বি., খ. ১, পৃ. ৭৬

সহজ করে দেয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। রুখসাত শব্দের মূলধাতু ر-خ-ص। এটি সাধারণত কাঠিন্য ও শুষ্কতার বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-সহজীকরণ, মূল্যহ্রাসকরণ, পেশাগত কোনো কাজের অনুমতি সম্বলিত লাইসেন্স প্রদান, কোনো বিষয়ে কাউকে সুযোগ প্রদান, নমনীয়তা ইত্যাদি।[১৬] এটি বহুবচনে رُخَصٌ ও رُخْصٌ রূপে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও শব্দটি নমনীয় হওয়া, বৈধতা দেয়া, অনুমতি প্রদান ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১৭]

রুখসাত-এর পারিভাষিক অর্থ

রুখসাত (الرخصة) শব্দটি আযীমাত শব্দের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। রুখসাত বলতে শরীয়তের ঐ সব বিধানকে বুঝায় যা মৌলিকভাবে প্রবর্তন করা হয়নি; বরং কোনো মানুষের ওযর থাকায় এবং মৌলিক বিধানের দলীল বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সংশ্লিষ্ট মাযূর ব্যক্তির জন্য বিধান শিথিল করে বিকল্প হিসেবে প্রবর্তন করা হয়েছে। ইমাম আস-সারাখসী রহ.-এর মতে, মানুষের ওযর বা অসুবিধার ওপর ভিত্তি করে যে বিধান দেয়া হয়েছে তাই রুখসাত। আর তা হলো এরূপঃ কোনো বিধান হারাম হওয়ার দলীল বিদ্যমান থাকা অবস্থায় মানুষের অক্ষমতার কারণে তার জন্য ঐ বিধানকে শিথিল করে দেয়া। বান্দার ওযরের ধরন যেহেতু বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে তাই সেই আলোকে রুখসাতের বিধানও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।[১৮]

ইমাম আশ-শাতিবী রহ. বলেন,

> وأما الرخصة؛ فما شرع لعذر شاق، استثناء من أصل كلي يقتضي المنع، مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه.
>
> দুঃসহ ওযরের কারণে যে বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে, তা-ই রুখসাত। এটা সর্বাত্মক বিধান থেকে সর্ম্পূণ আলাদা। অধিকন্তু, এ বিধান কেবল নিতান্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহে সীমাবদ্ধ থাকবে।[১৯]

যেমন, কোনো ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে অক্ষম, এমতাবস্থায় তার বসে নামায আদায়ের যে বিধান দেয়া হয়েছে তা-ই রুখসাত।

রুখসাত-এর শ্রেণি বিভাগ

সৃষ্টিগত দিক থেকে মানুষের মাঝে বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা থাকায় রুখসাতের সমাধান পেশের ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা রয়েছে। তাই সমাধান বিবেচনায় রুখসাতও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। প্রথমতঃ রুখসাত দুই প্রকার। যথা- ক. হাকীকী ও খ. মাজাযী।

---

১৬. ইবন মানযূর, *লিসানুল আরাব*, বৈরূত : দারু ইয়াহয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, ১৯৯২, খ. ৫, পৃ. ১৭৮

১৭. ড. মুহাম্মদ ফজলুল রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫, পৃ. ৪১৯

১৮. আস-সারাখসী, *উসূলুস সারখসী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৭

১৯. ইমাম আশ-শাতিবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২২৪

হাকীকী আবার দুই প্রকার। যেমন-

১. যে কাজ নিষিদ্ধ, তা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ ও নিষিদ্ধতার বিধান বহাল থাকা অবস্থায় মানুষের ওযরের কথা বিবেচনায় রেখে তা শিথিল করা হয়েছে। এ পর্যায়ের রুখসাতের মান সর্বোচ্চ। যেমন- একান্ত নিরুপায় অবস্থার শিকার কোনো ব্যক্তির জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা দেখা দিলে জীবন রক্ষার্থে অন্তরের বিশ্বাস বহাল রাখার শর্তে মুখে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করার বৈধতা। তবে কেউ যদি রুখসাতের ওপর আমল না করে প্রাণ বিসর্জন দেয়, তবে তা হবে 'আযীমত।[২০]

২. এ প্রকার রুখসাত প্রথম প্রকার রুখসাতের তুলনায় নিম্ন স্তরের। এটি হলো, কোনো নিষিদ্ধ কাজের নিষিদ্ধ হওয়ার কারণটি বিধান সাব্যস্তকারী হিসেবে বহাল থাকা। তবে নিষিদ্ধ হওয়ার বিধানটি তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর না হয়ে বিলম্বে প্রযোজ্য অবস্থায় মানুষের ওযরের কথা বিবেচনায় রেখে নিষিদ্ধতার বিধানটি শিথিল করা হয়েছে। যেমন- মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রমযানের সিয়াম ভঙ্গ করার নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান সাব্যস্তকারী কারণ রমযান মাসের উপস্থিতি বিদ্যমান। কিন্তু মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তির জন্য এ নিষিদ্ধের বিধানটি বিলম্বে কার্যকর হবে।[২১]

মাজাযী অর্থে রুখসাত দুই প্রকার :

১. পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য প্রবর্তিত কষ্টসাধ্য কাজ থেকে নিস্কৃতি দিয়ে উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য সহজসাধ্য বিধান কার্যকর করা। এটা রূপক অর্থে এক ধরনের রুখসাত। কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে-

﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾

এবং যিনি মুক্ত করেন তাদেরকে তাদের গুরুভার ও শৃঙ্খল হতে, যা তাদের ওপর ছিলো।[২২]

২. যে বিধানটি সামগ্রিকভাবে প্রণীত; কিন্তু ওযরের কারণে তা সাময়িকভাবে রহিত করা হয়। এরূপ বিধান যেহেতু ওযরের কারণে সর্বতোভাবে রহিত হয়ে যায়, তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ রহিত বিধানটিকে রূপক অর্থে রুখসাত বলা হয়। আর যেহেতু তা সামগ্রিক বিধান হিসেবে সর্বদা বিদ্যমান থাকে, এ দৃষ্টিকোণ থেকে তা প্রকৃত রুখসাতের সাথেও সাদৃশ্য রাখে।

যেমন, মুসাফিরের জন্য চার রাকআত বিশেষ নামাযের স্থলে প্রবর্তিত দুই রাকআত নামায। হানাফী আলিমগণের মতে, মুসাফিরের জন্য দুই রাকআতের বিধানটি চার রাকআতের স্থলাভিষিক্ত করে চার রাকআতের বিধানটি প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে।[২৩]

---

২০. আবদুল আযীয আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৩১৬

২১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৮

২২. আল-কুরআন, ৭ : ১৫৭

২৩. আবদুল আযীয আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৩২৪

রুখসাতের বিধান

রুখসাত যেহেতু মানুষের অপারগতার বিপরীত ইসলাম প্রদত্ত ছাড় বা সুযোগ, তাই তার মৌলিক বিধান হলো কোনো নিষিদ্ধ কাজের বৈধতা বা কোনো আবশ্যিক কাজের ব্যাপারে কাজটি করা না করার স্বাধীনতা। যেমন, একান্ত নিরুপায় ব্যক্তির জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা দেখা দিলে অন্তরে বদ্ধমূল বিশ্বাস রাখার শর্তে কুফরী কথা উচ্চারণ করার বৈধতা এবং অসুস্থতা কিংবা সফরজনিত ওযরের কারণে রমযানের সিয়াম পালন না করে পরবর্তী কোনো সময় তা পালন করা,[২৪] ক্ষুধার্ত ব্যক্তির অনন্যোপায় হয়ে মৃত জন্তুর গোশত ভক্ষণ করা প্রভৃতি রুখসাত ।

'আযীমাত ও রুখসাত -এর মধ্যে পার্থক্য

'আযীমাত ও রুখসাত শরীয়তের এমন দু'টি বিধান, যার একটি অপরটির বিপরীত। শাব্দিক অর্থে 'আযীমাত হলো দৃঢ়প্রত্যয় আর রুখসাত হলো শিথিলকৃত বিষয়। পারিভাষিক অর্থে 'আযীমাত হলো দলীল দ্বারা প্রমাণিত শরীয়তের এমন সব বিধান, যার বিপরীতে একই বিষয়ে তার চেয়ে অগ্রাধিকারযোগ্য কোনো বিধান বিদ্যমান নেই। তবে তার চেয়ে যদি শক্তিশালী কোনো বিধান পাওয়া যায় তাহলে তার উপর আমল করা অপরিহার্য। যেমনঃ তীব্র ক্ষুধা ও নিরূপায় অবস্থা ব্যতীত মৃত প্রাণির গোশত খাওয়া হারাম হওয়ার বিধানটি 'আযীমাত। কেননা এ বিষয়ে শরীয়তে এর বিপরীত অন্য কোনো অগ্রাধিকারযোগ্য বিধান নেই, কিন্তু যখন তীব্র ক্ষুধা ও নিরুপায় অবস্থা পাওয়া যাবে, তখন হারামের বিধানের বিপরীতে শক্তিশালী বিধান তথা জীবন রক্ষার বিধান পাওয়া গেল। এমতাবস্থায় জীবন রক্ষার্থে মৃত প্রাণির গোশত খাওয়া বৈধ হবে এবং রুখসাতের ওপর আমল করা অপরিহার্য হবে। মানুষের স্বাভাবিক অবস্থার সাথে চলমান বিধান হলো 'আযীমত, পক্ষান্তরে স্বাভাবিক অবস্থায় বাধাগ্রস্ত হওয়ার কারণে যে বিধান দেয়া হয় তা-ই রুখসাত। যেমনঃ মানুষের স্বাভাবিক অবস্থায় যথাযথভাবে সঠিক সময়ে নামায আদায় করা, রমযান মাসে রমযানের সিয়াম রাখা, পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানির ব্যবহার, মৃত প্রাণির গোশত, রক্ত ও শূকরের গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ হওয়া ইত্যাদি বিধান দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে অসুস্থতা, সফর, পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি না পাওয়া, আহারের জন্য খাদ্য না পাওয়া প্রভৃতি কারণে শৈথিল্য প্রদর্শনের মাধ্যমে উপরোক্ত বিধানসমূহ পরিবর্তন করে নির্দেশিত কাজ বাস্তবায়ন করার অনুমতি দিয়ে রুখসাতের বিধান দেয়া হয়েছে।[২৫]

---

২৪. ড. আবদুল করীম যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হ*, বৈরূত : মুয়াসসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৭, পৃ. ৫২

২৫. ইমাম আশ-শাতিবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৬৪

যে সব অবস্থায় 'আযীমাত রুখসাতে রূপান্তরিত হয়

'আযীমাত হলো মৌলিকভাবে সাব্যস্ত বিধান। রুখসাতের কারণসমূহের মধ্যে কোনো কারণ পাওয়া গেলে 'আযীমাতের বিধানটি রুখসাতে পরিণত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, শরীয়তের বিধান অনুযায়ী স্বাভাবিক অবস্থায় যথাসময় নামায আদায় করা, রমযান মাসের সিয়াম রাখা, পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা ইত্যাদি কাজগুলো 'আযীমাতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যখন কোনো ব্যক্তি সফরে বের হয়, তখন শরীয়ত তার ক্ষেত্রে চার রাকআত নামাযের কসর করার বিধান দিয়েছে। অনুরূপভাবে অসুস্থতার কারণে কোনো ব্যক্তি রমযানের সিয়াম রাখতে অপারগ হলে ঐ সময় তা না রেখে অন্য কোনো সময় রাখার বিধান দেয়া হয়েছে। এছাড়া পবিত্রতা অর্জনের জন্য কেউ কোনো কারণে পানি যোগাড় করতে অক্ষম হলে কিংবা অসুস্থতাজনিত কারণে পানি ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হলে, সেই ক্ষেত্রে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের বিকল্প হিসেবে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নেয়ার সুযোগ রয়েছে। আবার কোনো মুমিন ব্যক্তিকে জোরপূর্বক কেউ কুফরী বাক্য উচ্চারণে বাধ্য করলে তখন অন্তরের বিশ্বাস ঠিক রেখে মুখে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করলে কোনো পাপ হবে না। এভাবে 'আযীমত কখনো কখনো রুখসাতে রূপান্তরিত হয়।[২৬]

যে সব অবস্থায় রুখসাত 'আযীমাতের মর্যাদা লাভ করে

মুকাল্লাফ কখনো অস্বাভাবিক অবস্থার সম্মুখীন হলে 'আযীমাতের বিধান পরিবর্তন করে রুখসাতের বিধান দেয়া হয়। আর এ ধরনের রুখসাত কখনো কখনো 'আযীমাতের মর্যাদা লাভ করে। যেমন :

১. যখন রুখসাতের ওপর আমল করা আবশ্যক হয়ে যায়, তখন তা 'আযীমাতে পরিণত হয়। যেমন ক্ষুধার তীব্রতায় প্রাণনাশের আশংকা থাকা অবস্থায় মৃত প্রাণির গোশত ভক্ষণ, মদ্যপান বা অনুরূপ নিষিদ্ধ বস্তু গ্রহণের মাধ্যমে জীবন রক্ষা করা রুখসাত।

মহান আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর-মাংস এবং যার উপর আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ নাফরমান কিংবা সীমালঙ্ঘনকারী নয়, তার কোনো পাপ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২৭]

---

২৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩২

২৭. আল-কুরআন, ২ : ১৭৩

এ বিধানকে রুখসাত বলা হয়েছে এ অর্থে যে, উক্ত বস্তুনিচয়ের অপবিত্রতা যেমন দূর হয়নি, তদ্রূপ তা হারাম হওয়ার বিধানও বলবৎ আছে। কেবল নিরুপায় ব্যক্তির সুবিধার্থে এ বৈধতার বিধান দেয়া হয়েছে। অপরদিকে এটিকে এ কারণে আযীমাত বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি উপরোক্ত অবস্থার সম্মুখীন হয়েও উক্ত বস্তুসমূহের কোনো একটি ভক্ষণ করা থেকে বিরত থেকে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।[২৮]

অপর এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ﴾

এবং নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।[২৯]

ইমাম আশ-শাতিবী রহ. উপর্যুক্ত আয়াতদ্বয়ের আলোকে বলেন, প্রাণ রক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা শরীআতের মৌলিক বিধানের অন্তর্ভুক্ত, কাজেই মৃত প্রাণির গোশত ভক্ষণ ব্যতীত প্রাণরক্ষার অপর কোনো উপায় না থাকলে তা 'আযীমাত হিসেবে গণ্য হবে, যদিও তা মানুষের সমস্যা দূরীকরণের মাধ্যম হওয়ায় তাকে রুখসাত বলা হয়।[৩০]

এ অবস্থায় যেহেতু মুকাল্লাফকে মৃতপ্রাণি ভক্ষণ করা বা না করার ব্যাপারে ইখতিয়ার দেয়া হয়নি বরং তা ভক্ষণ করা বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে, তাই তাকে রুখসাত না বলাই সমীচীন। এছাড়া এ বিষয়ের সাথে আল্লাহ ও বান্দার হক জড়িত, আর যে বিষয়ের সাথে আল্লাহ ও বান্দার হক জড়িত থাকে, তা আল্লাহর হকের বিবেচনায় 'আযীমাত আর বান্দার হকের বেলায় রুখসাত সাব্যস্ত হবে।[৩১]

কোনো কোনো ফকীহ ও উসূলবিদ উপরোক্ত মাসআলার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দু'টি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একটি হলো, কোনো অসুস্থ ব্যক্তির সিয়াম পালন করার কারণে যদি প্রাণনাশের আশংকা থাকে এমতাবস্থায় তার সিয়াম পালন না করা আবশ্যক। আর সিয়াম পালন করার কারণে যদি সে মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে নিজেই নিজের হত্যাকারী গণ্য হবে।[৩২]

আর অপরটি হলো, কোনো ব্যক্তি সফরে থাকা অবস্থায় কিংবা অসুস্থ অবস্থায় সিয়াম পালনকালীন যদি কেউ তাকে জোরপূর্বক সিয়াম ভঙ্গ করাতে চায় এবং এর অন্যথা

---

২৮. আল-কুরআন, ৪ : ২৯

২৯. আল-কুরআন, ২ : ১৯৫

৩০. ইমাম আশ-শাতিবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৩৩

৩১. সাইফুদ্দীন আবুল হাসান আলী আল-আমিদী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১১৪

৩২. আস-সারাখসী, *উসূলুস সারখসী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২০

করলে জীবননাশের হুমকি দেয়, এমতাবস্থায় সিয়াম পালন করার কারণে যদি সে হুমকিদাতার হাতে নিহত হয়, তাহলে যে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। কারণ এরূপ অবস্থার মহান আল্লাহ তার জন্য সিয়াম ভঙ্গ করার অবকাশ রেখেছেন। এ অবস্থায় সিয়াম ভঙ্গ না করে নিহত হওয়া তার জন্য 'আযীমাত নয়; যেমনটি মুকীম ও সুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[৩৩]

রুখসাতের বিধান ব্যতীত মুকাল্লাফের জন্য অপর কোনো বিকল্প বিধান না পাওয়া গেলে তখন ঐ বিধানই তার জন্য 'আযীমাত বলে গণ্য হবে। যেমন, শাফিঈ মাযহাবের ইমামগণ বলেন, ঋতুমতী ও প্রসূতি মহিলার নামায না পড়ার বিষয়টি 'আযীমাত। কেননা নামায না পড়ার বিধানটিই তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অন্য কোনো বিধান তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আর একই ব্যক্তিকে একই সময়ে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশদানের পর তা আবার বাস্তবায়ন করার নির্দেশ প্রদান যুক্তিসংগত নয়।[৩৪]

ইমাম আশ-শাতিবী রহ. বলেন, "সর্বাবস্থায় আযীমাতের উপর আমল করা উত্তম। কেননা এতে নিহিত রয়েছে ঈমানের সর্বোচ্চ পরীক্ষা ও আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপনের মূল রহস্য।"[৩৫]

রুখসাত প্রবর্তনের কারণ

'আযীমাত হলো শরীয়তের মৌলিক বিধান, যা স্বাভাবিক অবস্থায় মুকাল্লাফের জন্য একান্ত করণীয় আর রুখসাত হলো মুকাল্লাফের কোনো যৌক্তিক সমস্যা সৃষ্টির হওয়ার কারণে তার জন্য প্রবর্তিত বিকল্প বিধান। উসূলবিদগণ শরীয়তের বিধান পালনের সুবিধার্থে এর দলীলসমূহ মন্থন করে যে সকল মূলনীতি তৈরি করেছেন তন্মধ্যে অন্যতম হলো, المشقة تجلب التيسير। অর্থাৎ 'কষ্ট-ক্লেশ সহজ বিধানকে টেনে আনে'। এ মূলনীতির সপক্ষে কুরআন মাজীদের নিম্ন বর্ণিত আয়াতগুলোতে সমর্থন পাওয়া যায়:

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾

তোমাদের জন্য যা সহজ আল্লাহ তাই চান এবং যা তোমাদের জন্য কঠিন তা চান না।[৩৬]

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾

আল্লাহ চান তোমাদের বোঝা হালকা করে দিতে আর মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।[৩৭]

---

৩৩. আব্দুল আযীয আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৩১৮
৩৪. বাদরুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ আল-যারকাশী, *আল-বাহরুল মুহীত*, তা. বি., খ. ১, পৃ. ৪০৫
৩৫. ইমাম আশ-শাতিবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪০
৩৬. আল-কুরআন, ২ : ১৮৫
৩৭. আল-কুরআন, ৪ : ২৮

কুরআন মাজীদে অন্যত্র বলা হয়েছে:

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি।[৩৮]
উপরোক্ত আয়াত সমূহ ছাড়াও এ সম্পর্কিত বহু আয়াত ফিকহ ও উসূলে ফিক্হ-এর গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৯]
রুখসাত যেহেতু শরীয়তের বিকল্প বিধান, তাই তা প্রবর্তনের পেছনে কোনো না কোনো কারণ নিহিত থাকে। উসূলবিদগণ রুখসাত বা শরীয়তের বিধান সহজীকরণের সাতটি কারণ উল্লেখ করেছেন। কারণগুলো হলো: (১) অসুস্থতা, (২) সফর, (৩) নিরুপায় অবস্থার সম্মুখীন হওয়া, (৪) অজ্ঞতা, (৫) সৃষ্টিগত অক্ষমতা, (৬) ভুলে যাওয়া এবং (৭) কষ্টসাধ্যতা।[৪০]
রুখসাতের কারণ ও তৎসংশ্লিষ্ট শরীয়তের নির্দেশনা তুলে ধরা হলো:

১. অসুস্থতা

শরীয়তের বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সহজীকরণ বা রুখসাতের সুযোগ প্রদানের কারণসমূহের অন্যতম হলো অসুস্থতা। অসুস্থতার কারণে শরীয়তের অনেক বিষয়ে রুখসাতের বিধান দেয়া হয়েছে। যেমন পানি ব্যবহার কষ্টসাধ্য হলে তায়াম্মুম করা, দাঁড়িয়ে নামায পড়তে অক্ষম ব্যক্তির বসে, শুয়ে কিংবা ইশারায় ফরয নামায আদায় করা, রমযান মাসে সিয়াম না রাখা, বদলী হজ্জ করানো, কেবল চিকিৎসার জন্য কারো লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি দেয়া ইত্যাদি।[৪১]

ক. পানি ব্যবহার কষ্টসাধ্য হলে তায়াম্মুম করার রুখসাত

কোনো ব্যক্তি যদি এমন পর্যায়ের অসুস্থ হয় যে, গোসল কিংবা উযূ করার নিমিত্তে পানি ব্যবহার তার কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে কিংবা জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, এ ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে তার তায়াম্মুম করা বৈধ হবে।[৪২]
দলীল : মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

এবং তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচকার্য থেকে আগমন করে অথবা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সংগত হও এবং

---

৩৮. আল-কুরআন, ২২ : ৭৮
৩৯. যায়নুদ্দীন ইবন ইবরাহীম ইবন নুজাইম, *আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর*, তা. বি., পৃ. ১৩৮
৪০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫
৪১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০
৪২. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, তা. বি., খ. ১, পৃ. ৩২২

পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতে মাসেহ করবে। আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না। বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তার অনুগ্রহ পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।[৪৩]

জাবির রা. বলেন, "আমরা একবার এক সফরে বের হলাম। এ সময় পাথরের আঘাত লেগে এক ব্যক্তির মাথা ফেটে যায়। তার স্বপ্ন দোষ হলে সে তার সঙ্গীদের কাছে তায়াম্মুম করার সুযোগ আছে কিনা সে বিষয় জানতে চায়। তারা বলল, তুমি যেহেতু পানি ব্যবহারে সক্ষম, তাই তোমার তায়াম্মুম করার সুযোগ নেই। অতঃপর সে গোসল করলো। ফলে তার মৃত্যু হলো। আমরা নবী স. এর নিকট আসলে তাঁকে বিষয়টি অবহিত করা হলো। তিনি বললেন,

« قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلاَ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ. أَوْ « يَعْصِبَ ». شَكَّ مُوسَى « عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ».

তারা তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন! তিনি আরো বললেন, তাদের যেহেতু এ বিষয়ে সমাধান জানা ছিল না, কাজেই তাদের উচিত ছিল জিজ্ঞেস করে তা জেনে নেয়া। কারণ অজ্ঞতার প্রতিষেধক হলো জিজ্ঞেস করা। ঐ লোকটির তায়াম্মুম করাই যথেষ্ট ছিলো। জখমের উপর কাপড় বেঁধে তার উপর মাসেহ করে অবশিষ্ট পুরো শরীর ধুয়ে ফেললেই যথেষ্ট হতো।[৪৪]

অসুস্থ ব্যক্তি উযূ করলে যদি প্রাণহানি বা অঙ্গহানির আশংকা নাও থাকে, এমতাবস্থায় রোগ বেড়ে যাওয়া কিংবা নিরাময়ে বিলম্ব ঘটার আশংকা থাকলে কিংবা ক্ষতস্থানের যন্ত্রণা বৃদ্ধির আশংকা থাকে তার তায়াম্মুম করা বৈধ হবে। এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ রহ. ঐকমত্য পোষণ করেছেন।[৪৫]

খ. ফরয নামায দাঁড়িয়ে আদায় না করার ব্যাপারে রুখসাত

ফরয নামায দাঁড়িয়ে পড়া শরীয়তের নির্দেশ। অসুস্থতার কারণে কেউ দাঁড়িয়ে আদায় করতে না পারলে বসে কিংবা শুয়ে অথবা ইশারায় পড়ার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান রয়েছে।[৪৬]

দলীল : মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَاذْكُرُواْ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴾

তোমরা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে।[৪৭]

---

৪৩. আল-কুরআন, ৫ : ৬

৪৪. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আত-তাহারাত, পরিচ্ছেদ : আল-মাজরূহ ইয়াতায়াম্মুম, *আল-কুতুবুস সিত্তাহ্*, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ১২৪৮, হাদীস নং-৩৩৬

৪৫. ইমাম আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩২২

৪৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯

৪৭. আল-কুরআন, ৪ : ১০৩

ইমরান ইবন হুসাইন রা. বলেন, আমি অর্শ্ব রোগে আক্রান্ত হয়ে নবী স.-এর কাছে নামায পড়ার বিধান জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন:

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

তুমি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে, আর যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে না পার, তবে বসে নামায আদায় করবে আর তাও যদি না পার তবে একপাশ কাত হয়ে নামায পড়বে।[৪৮]

আলী রা. বলেন, নবী স. বলেছেন,

يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِماً إِن اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعِداً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَأَ وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِداً صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ صَلَّى مُسْتَلْقِياً رِجْلَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ

অসুস্থ ব্যক্তি সক্ষম হলে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। দাঁড়াতে অক্ষম হলে বসে নামায পড়বে আর সিজদা করতে অক্ষম হলে ইশারা করে সিজদা করবে এবং সিজদা হবে রুকুর চেয়ে খানিকটা নিচু। আর যদি বসেও নামায আদায় করতে অপারগ হয় তাহলে কিবলার দিকে মুখ করে ডান কাতে শুয়ে নামায পড়বে। এতেও যদি অপারগ হয় তবে কিবলার দিকে পা রেখে চিৎ হয়ে নামায আদায় করবে।[৪৯]

কোনো কোনো ফিক্হবিদ বলেন, অসুস্থ ব্যক্তি বসে নামায আদায় করতে অক্ষম হলে যেভাবে সম্ভব সেইভাবে নামায আদায় করবে।[৫০]

গ. অসুস্থতার কারণে রমযানের সিয়াম রমযান মাসে না রাখার রুখসাত

অসুস্থ ব্যক্তি রমযানের সিয়াম রাখলে রোগ বেড়ে যাওয়া, রোগ নিরাময়ে বিলম্ব হওয়া, নতুন করে আরো অসুস্থ হয়ে পড়ার আশংকা থাকলে তার রমযানের সিয়াম অন্য সময় রাখা যাবে।[৫১]

দলীল : মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾

তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে।[৫২]

---

৪৮. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আত-তাফসীর, পরিচ্ছেদ : ইযা লাম ইউতিক কায়িদান সাল্লা আলা জামবিন, *আল-কুতুবুস সিত্তাহ*, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ৮৭ , হাদীস নং-১১১৭

৪৯. ইমাম আদ-দারাকুতনী, *আস-সুনান*, তা. বি., খ. ৪, পৃ. ৪২৬, হাদীস নং-১৭২৫

৫০. ইবন রুশদ আল-কুরতুবী, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ*, তা.বি., খ. ১, পৃ. ১৭৮

৫১. ইবন কুদামা, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ১৪৯-১৫০; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, তা. বি., খ, ৪, পৃ. ৩৭৭

৫২. আল-কুরআন, ২ : ১৮৪

ঘ. বার্ধক্যজনিত কারণে রুখসাত

অতিশয় বৃদ্ধ; চাই সে নারী হোক কি পুরুষ- যদি সে রমযানের সিয়াম রাখতে না পারে, তবে প্রত্যেক সিয়ামের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্যদানের মাধ্যমে ফিদয়া আদায় করলে দায়িত্ব মুক্ত হতে পারবে।

আলী, ইবন আব্বাস, আবু হুরায়রা, আনাস ইবন মালিক রা., সাঈদ ইবন জুবাইর, তাউস, ইমাম আবু হানীফা, আওযা'ই, আহমাদ ইবন হাম্বাল ও শাফিঈ রহ. উপর্যুক্ত অভিমত দিয়েছেন।[৫৩]

দলীল : মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾

আর এটি যাদের জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদয়াই একজন অভাবগ্রস্তকে খাবার দান করা।[৫৪]

ইবন আব্বাস রা. উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

বৃদ্ধ পুরুষ কিংবা বৃদ্ধ নারী যদি সিয়াম রাখতে অক্ষম হয় তাহলে তারা প্রত্যেক সিয়ামের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্যদানের বিনিময়ে সিয়াম না রাখার সুযোগ পাবে।[৫৫]

উল্লেখ্য যে, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়িনী নারীর ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য। তারা সুযোগ মতো সিয়াম রাখবে, তাদের কাফফারা কিংবা ফিদইয়া দিতে হবে না। এ বিষয়ে প্রধান চার মাযহাবের ইমাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন।[৫৬]

দলীল : মহানবী স. বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلاةِ وَالصَّوْمَ وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ

নিশ্চয় মহান আল্লাহ মুসাফিরের উপর থেকে অর্ধেক নামায রহিত করেছেন এবং সিয়াম রহিত করেছেন এবং তিনি গর্ভবতী ও স্তন্যদায়িনী নারীর দায়িত্ব থেকে সিয়াম রহিত করে দিয়েছেন।[৫৭]

---

৫৩. ইবন কুদামা, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ১৩৮

৫৪. আল-কুরআন, ২ : ১৮৪

৫৫. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আত-তাফসীর, পরিচ্ছেদ : কওলুহু তাআলা আইয়ামাম মা'দূদাত..., *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৯, হাদীস নং-৪৫০৫

৫৬. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪৪

৫৭. ইমাম নাসাঈ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আস-সিয়াম, পরিচ্ছেদ : যিকরু ইখতিলাফি মু'আবিয়া ইবন সালাম ওয়া আলী ইবনুল মুবারক ফী হাযা, *আল-কুতুবুস সিত্তাহ*, রিয়াদ : দারুস-সালাম, ২০০০, পৃ. ২২৩৫, হাদীস নং-২২৭৪

ঙ. অসুস্থতাজনিত কারণে বদলী হজ্জ করার সুযোগ

হজ্জ ফরয-এমন ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়লে এবং নিজের সুস্থতা ফিরে আসার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়লে, যার ফলে তার পক্ষে হজ্জ পালন করা সম্ভব হবে না মনে করে, এরূপ ব্যক্তির বদলী হজ্জ করানোর বিধান শরীয়তে স্বীকৃত। এটাই অধিকাংশ ফিক্‌হবিদের অভিমত।[৫৮]

দলীল : আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. বলেন, বিদায় হজ্জের সময় খাস'আম গোত্রের এক মহিলা এসে রাসূলুল্লাহ স.কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতার উপর হজ্জ ফরয অথচ তিনি অতি বৃদ্ধ হওয়ার কারণে বাহনে বসে থাকতে অপারগ। এমতাবস্থায় আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ।[৫৯]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, যার উপর হজ্জ ফরয অথচ সে যদি হজ্জ আদায়ে শারীরিকভাবে অক্ষম হয়, তবে তার বদলী হজ্জের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। সে হজ্জ না করে মৃত্যুবরণ করলে তার উত্তরাধিকারীদের জন্য তা আদায় করিয়ে নেয়া ফরয।[৬০]

জাবির রা. বলেন,

> حججنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ومعنا النساء والصبيان . فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم
>
> আমরা রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে হজ্জ আদায় করেছি এবং আমাদের সাথে নারী ও শিশুরা ছিলো। তখন আমরা শিশুদের পক্ষ থেকে তালবিয়া পাঠ করেছি এবং কংকর নিক্ষেপ করেছি।[৬১]

এ হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করে ফিক্‌হবিদগণ অসুস্থতা কিংবা অপর কোনো অক্ষমতার কারণে কংকর নিক্ষেপে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রতিনিধির মাধ্যমে কংকর নিক্ষেপ বৈধ হওয়ার দলীল গ্রহণ করেন।

---

৫৮. সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, তা. বি., খ. ১, পৃ. ৬৩৭

৫৯. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : জাযাউস-সায়দ, পরিচ্ছেদ : আল-হাজ্জ আম্মান লা ইয়াসতাতিউস সুবূত আলার রাহিলাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫, হাদীস নং-১৮৫৪
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ

৬০. *ইমাম আন-নাবাবী, শারহুন নাবাবী লি-সহীহ্ মুসলিম*, আল-কাহেরা : দারুর রাইয়ান, ১৯৮৭, খ. ৪, পৃ. ৪৯৫

৬১. ইমাম ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-মানাসি, পরিচ্ছেদ : আর-রামি আনিস-সিবয়ান, *আল-কুতুবুস-সিত্তাহ*, রিয়াদ : দারুস-সালাম, ২০০০, পৃ. ২৬৬০, হাদীস নং-৩০৩৮

২. সফর

সাঈদ ইবন আলী আল-কাহতানী রহ. বলেন, সফর বলতে পায়ে হেঁটে বা উটের পিঠে আরোহণ করে তিন দিন তিন রাতের দূরত্ব বা তার চেয়ে বেশি পথ অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে নিজ বাসভবন থেকে বের হওয়াকে বোঝায়।[৬২]

মুকাল্লাফের সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যেই মূলত রুখসাতের বিধান দেয়া হয়েছে। সফরে যেহেতু মুকাল্লাফের বিভিন্ন ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, তাই তার জন্য শরীয়ত অনেক বিষয়ে রুখসাতের বিধান প্রবর্তন করেছে। নবী স. বলেন,

> السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ
>
> সফর হলো আযাবের অংশ। কেননা তা পানাহার ও নিদ্রার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অতএব, তার প্রয়োজন মিটে গেলে অবিলম্বে বাড়ি ফিরে আসা উচিত।[৬৩]

সফরের কথা বিবেচনায় এনে রুখসাতের বিধান দেয়া সত্ত্বেও যদি কোনো সফরে মুসাফির কষ্ট অনুভব না করে তাতে রুখসাতের বিধান রহিত হবে না। বিশিষ্ট ফিক্‌হবিদ ইবন নুজাইম রহ. সফরের কারণে প্রবর্তিত রুখসাতের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রুখসাত নিম্নে প্রদত্ত হলো:

ক. কসর

সফর অবস্থায় সলাত কসর (চার রাকআতের স্থলে দুই রাকআত) করা অন্যতম রুখসাত। সফর ব্যতীত অন্য কোনো অবস্থায় নামায সংক্ষিপ্ত করার কোনো সুযোগ নেই। কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা কসরের বিধান প্রবর্তিত। মহান আল্লাহ বলেন,

> ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾
>
> তোমারা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে তখন যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিররা তোমাদের জন্য ফিতনার সৃষ্টি করবে, তাহলে সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোনো দোষ নেই। নিশ্চয় কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[৬৪]

ই'য়ালা ইবন উমাইয়া রা. বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর কাছে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, লোকেরা তো এখন নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছে (এ অবস্থায় এ আয়াতের বিধান কী হবে?)। তিনি বললেন, তুমি যেমন অবাক হয়েছ আমিও

---

৬২. ইমাম সাঈদ ইবন আলী আল-কাহতানী, *আস-সাফার ওয়া আহকামুহু ফী দাউয়িল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ*, রিয়াদ : আল -ওযারাতুল আওকাফ ওয়াদ-দাওয়াহ, ১৪২২, খ. ১, পৃ. ৪

৬৩. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-উমরা, পরিচ্ছেদ : আস-সাফারু কিতআতুম মিনাল আযাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১, হাদীস নং-১৮০৪

৬৪. আল-কুরআন, ৪ : ১০১

তদ্রূপ অবাক হয়েছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাবে তিনি বললেন, صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এক প্রকার সাদকা। অতএব, তোমরা তার প্রদত্ত সাদকা গ্রহণ করো।[৬৫]

ইবন আব্বাস রা. বলেন,

فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ -صلى الله عليه وسلم- فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً.

মহান আল্লাহ তোমাদের নবীর স. ভাষায় মুকীম অবস্থায় চার রাকআত, সফর অবস্থায় দুই রাকআত এবং ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এক রাকআত করে নামায ফরয করেছেন।[৬৬]

পবিত্র কুরআনে সফর অবস্থায় কসর নামায পড়ার এবং হাদীসসমূহে সফর অবস্থায় চার রাকআতের স্থলে দুই রাকআত নামায আদায়ের ব্যাপারে নির্দেশনা রয়েছে, যা সুস্পষ্টভাবে রুখসাতের প্রমাণ দেয়।

ইবনুল মুনযির বলেন, "হজ্জ, উমরা বা জিহাদের যেসব সফরে নামায কসর করার বিধান রয়েছে তাতে চার রাকআত নামায সংক্ষিপ্ত করে দুই রাকআত আদায় করার ব্যাপারে ফিক্‌হবিদগণের ইজমা রয়েছে এবং এ বিষয়েও ইজমা রয়েছে যে, মাগরিব ও ফজর নামাযে কসর করা বৈধ নয়"।[৬৭]

খ. দুই নামায একত্রীকরণ

সফর অবস্থায় যুহরের নামায শেষ ওয়াক্তে ও আসরের নামায প্রথম ওয়াক্তে এবং মাগরিবের নামায শেষ ওয়াক্তে ও ইশার নামায প্রথম ওয়াক্তে আদায়ের বিধান শরীআতে স্বীকৃত। একে দুই ওয়াক্ত নামায একত্রীকরণ (الجمع بين الصلاتين) বলা হয়। এ ব্যাপারে ফিকহবিদগণের ঐকমত্য রয়েছে।[৬৮]

দলীল : মু'আয রা. বলেন,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا

---

৬৫. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : সালাতুল মুসাফিরীন, পরিচ্ছেদ : সালাতুল মুসাফিরীন ও কাসরিহা, *আল-কুতুবুস সিত্তাহ,* রিয়াদ : দারুস-সালাম, ২০০০, পৃ. ৭৮৫, হাদীস নং-১৬০৫

৬৬. ইমাম মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৭৮৫, হাদীস নং-১৬০৭

৬৭. ইবন কুদামা, *প্রাগুক্ত,* খ. ৪, পৃ. ২৫; ইবন হাজার আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী,* অধ্যায় : তাকসীরুস সালাহ, পরিচ্ছেদ : ইউসাল্লিল মাগরিব সালাছান ফিস-সাফার, আল-কাহেরা : দারুর রাইয়ান লিত-তুরাস, ১৯৮৮, খ. ২, পৃ. ৬৬৬

৬৮. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত,* প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩৯; ইবন তাইমিয়্যাহ, *মাজমূ ফাতাওয়া ইবন তাইমিয়্যাহ,* তা.বি., খ. ৫, পৃ. ৩৯০

আমরা রাসূলুল্লাহ স. এর সাথে তাবুক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলাম। তিনি সেখানে যুহর ও আসর নামায একত্রে এবং মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেন।[৬৯]

গ. সফর অবস্থায় সিয়াম পালন

সফর অবস্থায় রমযানের সিয়াম না রাখার বিষয়টি কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

এবং কেউ পীড়িত হলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করবে।[৭০]

আয়িশা রা. বলেন, হামযা ইবন আমর আল-আসলামী রা. রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে সফর অবস্থায় সিয়াম রাখার বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ

তুমি ইচ্ছা করলে সিয়াম রাখতেও পারো, আবার তুমি সিয়াম নাও রাখতে পারো।[৭১]

অপর একটি হাদীসে উল্লেখ আছে, হামযা ইবন আমর আল-আসলামী রা. রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি সফর অবস্থায় সিয়াম রাখতে সক্ষম, কাজেই আমি সিয়াম রাখলে তা কি দূষণীয় হবে? জবাবে রসূলুল্লাহ স. বললেন,

هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ

এটি আমাদের পক্ষ থেকে রুখসাত। অতএব, যে ব্যক্তি এ রুখসাত গ্রহণ করবে তা তার জন্য উত্তম। আর যে ব্যক্তি সিয়াম রাখা পছন্দ করে তার কোনো দোষ হবে না।[৭২]

ঘ. জুমুআর নামায আদায় না করা

মুসাফিরের জন্য জুমুআর নামায না পড়ার বিষয়ে রুখসাত রয়েছে। সফর অবস্থায় জুমুআর নামাযের পরিবর্তে যুহরের দুই রাকআত ফরয নামায পড়াই যথেষ্ট। এটা ফিকহবিদগণের সর্বসম্মত অভিমত।[৭৩]

দলীল : জাবির রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ

---

৬৯. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : সালাতুল মুসাফিরীন, পরিচ্ছেদ : আল-জামউ বাইনাস সালাতাইন ফিল হাযার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮৮, হাদীস নং-১৬৬৫

৭০. আল- কুরআন, ২ : ১৮৫

৭১. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আস-সাওম, পরিচ্ছেদ : আস-সাওমু ফিস-সাফার ওয়াল ইফতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২, হাদীস নং-১৯৪৩

৭২. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আস-সাওম, পরিচ্ছেদ : আত-তাখয়ীরু ফিস-সাওমি ওয়াল ফিতরি ফিস-সাফার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫৮, হাদীস নং-২৬২৯

৭৩. ইবন কুদামা, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ১৮০

> যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে তার জুমুআর নামায পড়া ফরয। তবে অসুস্থ, মুসাফির, নারী, শিশু ও দাসের ওপর ফরয নয়।[৭৪]

ফিকহবিদগণ আরো বলেন, নবী স. সফরে জুমুআর নামায পড়তেন না। এ ছাড়া তিনি বিদায় হজ্জের সময় জুমুআর দিনে আরাফাতের মাঠে জুমুআর নামায না পড়ে যুহর ও আসর নামায একত্রে আদায় করেছেন। খুলাফায়ে রাশেদীন, অন্যান্য সাহাবী ও তাবিঈগণ সফরে থাকা অবস্থায় জুমুআর নামায পড়তেন না।[৭৫]

ঙ. কুরবানী না করা

সফর অবস্থায় কুরবানী না করার বিষয়ে শরীয়তে রুখসাত রয়েছে, তবে মুসাফিরের কুরবানী করা মুস্তাহাব এবং কুরবানী না করার চেয়ে বরং কুরবানী করা উত্তম।

দলীল : আলী রা. বলেন, "মুসাফিরের জন্য জুমুআর নামায আদায় করা এবং কুরবানী দেয়া অত্যাবশ্যক নয়।"[৭৬] উল্লেখ্য যে, এ রুখসাত মূলত দীর্ঘ সফরের সাথে সংশ্লিষ্ট, সংক্ষিপ্ত সফরে এ রুখসাত প্রযোজ্য নয়।[৭৭]

চ. যে কোনো স্ত্রীকে সফরসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করা

কোনো ব্যক্তির যদি একাধিক স্ত্রী থাকে এবং সে যদি কাউকে তার সফরসঙ্গী হিসেবে মনোনীত করে, পরবর্তীতে অন্যান্যদের জন্য সফরে থাকা দিনগুলো গণনা করে সমতা বিধান করা আবশ্যক নয়। এটা সফরের জন্য রুখসাত।[৭৮] তবে মহানবী স. সফরে বের হওয়ার পূর্বে তাঁর স্ত্রীগণের মাঝে তাদের অন্তরের প্রশান্তির জন্য লটারী করতেন, লটারী করার অপরিহার্যতা বুঝানোর জন্য নয়।[৭৯]

৩. নিরুপায় অবস্থার সম্মুখীন হওয়া

কেউ যদি নিরুপায় হয়ে কোনো কাজ করে তার বিধান বিভিন্ন রকম হতে পারে। আর যে কাজ করতে বাধ্য করা হয় তার ধরন ও বাধ্যকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আলোকে তা নির্ধারিত হয়ে থাকে। নিরুপায় অবস্থার শিকার ব্যক্তি যদি একান্তই বাধ্য হয়ে কোনো কাজ করে, ইসলাম তাকে ক্ষমা করার বিধান রেখেছে। মহান আল্লাহ্ বলেছেন :

﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾

তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত।[৮০]

---

৭৪. *ইমাম আদ-দারাকুতনী, *প্রাগুক্ত* , পৃ. ২৬৭, হাদীস নং-১৫৯৫

৭৫. ইবন কুদামা, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ১৮০

৭৬. ইবনুল হুমাম, *প্রাগুক্ত*, খ, ২২, পৃ. ৮৯

৭৭. আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-হানাফী, *গামযু উয়ুনিল বাসাইর ফী শারহিল আশবাহ ওয়ান নাযাইর*, তা. বি., খ. ২, পৃ. ২০

৭৮. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত , খ. ৭, পৃ .৯৪

৭৯. প্রাগুক্ত

৮০. আল-কুরআন, ১৬ : ১০৬

রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন :

إِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

নিশ্চয় মহান আল্লাহ আমার উম্মাতের ত্রুটি-বিস্মৃতি এবং যে কাজ করতে বাধ্য করা হয় তা ক্ষমা করে দেন।[৮১]

নিরুপায় অবস্থার শিকার ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য কতিপয় মাসআলা :

ক. জোর পূর্বক কাউকে কুফরী বাক্য উচ্চারণে বাধ্য করলে

কাউকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে কুফরী বাক্য উচ্চারণে বাধ্য করলে এবং কুফরী বাক্য উচ্চারণ না করলে প্রাণনাশের আশংকা থাকলে, অন্তরের অতল গহীনে ঈমান রাখার শর্তে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করা বৈধ। এভাবে মানুষের জীবন রক্ষার স্বার্থে রুখসাতের বিধান দেয়া হয়েছে।

দলীল : মহান আল্লাহ বলেছেন :

﴿ مَن كَفَرَ بِاللّٰهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

কেউ ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তার জন্য আছে মহাশাস্তি তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত।[৮২]

বিশিষ্ট সাহাবী আম্মার ইবন ইয়াসির রা. যখন মুশরিকদের অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে কতিপয় ঈমান বিরোধী কথা বলেছিলেন, তখন উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।[৮৩] তবে কেউ যদি কুফরী বাক্য উচ্চারণ না করে প্রাণ বিসর্জন দেয়, তবে সে আযীমতের উপর আমলকারী বিবেচিত হবে। আর এটাই হচ্ছে সত্যিকার জিহাদ।[৮৪]

খ. রমযানের সিয়াম ভেঙ্গে ফেলতে বাধ্য করলে

রমযান মাসে মুকীম অবস্থায় কোনো ব্যক্তিকে সিয়াম ভেঙ্গে ফেলতে বাধ্য করা হলে অথবা সিয়াম রাখার কারণে প্রাণহানির আশংকা দেখা দিলে জীবন রক্ষার্থে সিয়াম ভেঙ্গে ফেলা তার জন্য বৈধ, তবে উক্ত ব্যক্তিকে পরবর্তী সময়ে সিয়াম কাযা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে অসুস্থ বা মুসাফির ব্যক্তির বিধান এক রকম নয়। কেননা সফর বা অসুস্থ অবস্থায় সিয়াম না রাখার বিধান রয়েছে।[৮৫]

---

৮১. ইমাম ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আত-তালাক, পরিচ্ছেদ : তালাকুল মুকরাহ ওয়ান-নাসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯৯, হাদীস নং-২০৪৫

৮২. আল-কুরআন, ১৬ : ১০৬

৮৩. ইমাম আত-তাবারী, *জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন*, তা.বি. খ. ১৭, পৃ. ৩০৪

৮৪. ইবন কুদামা, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৯, পৃ. ৪৯২; আস-সারাখসী, *উসূলুস সারাখসী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৮

৮৫. আস-সারাখসী, *উসূলুস সারাখসী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

গ. কাউকে ব্যভিচারে বাধ্য করলে

কোনো ব্যক্তিকে কারো সাথে ব্যভিচার করতে বাধ্য করলে এবং সেই ব্যক্তি ব্যভিচার করলে তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে সরকার প্রধান কাউকে ব্যভিচারে বাধ্য করলে উক্ত ব্যভিচারীর প্রতি ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না। ইমাম আবু হানীফা রহ. যুক্তি প্রদান করে বলেন, সরকার প্রধান যখন কোনো কাজে তার নাগরিককে বাধ্য করেন তখন তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা সমীচীন হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর মতে ব্যভিচারে বাধ্য ব্যক্তির উপর ব্যভিচারের শাস্তিপ্রয়োগ করা যথার্থ নয়।[৮৬]

ঘ. অমুসলিমের শাস্তি থেকে বাঁচার লক্ষ্যে অন্তরে শত্রুতা রেখে প্রকাশ্যে বন্ধুত্ব প্রকাশ করার রুখসাত

কোনো অমুসলিমের পক্ষ থেকে নির্যাতন কিংবা জীবননাশের আশংকা দেখা দিলে বাহ্যিকভাবে তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করার সুযোগ রয়েছে।

দলীল : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ لَاَ يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَيْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾

মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক থাকবে না, তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট থেকে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করো। আর আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করছেন এবং আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন।[৮৭]

৪. ভুলে যাওয়া

শরীয়তের বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে যে সব কারণ বিবেচনায় রেখে রুখসাতের সুযোগ দেয়া হয়েছে তার অন্যতম হলো ভুলে যাওয়া। কোনো কিছু মনে রাখতে না পারা কিংবা ভুলে যাওয়া মানুষের সহজাত বিষয়। পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম আ. আল্লাহর নির্দেশ ভুলে যান। কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে:

﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا ﴾

আমি তো ইতঃপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল এবং আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাইনি।[৮৮]

---

৮৬. ইবনুল হুমাম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২০, পৃ. ৪৮০; ইবন হাজার আল-আসকালানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১২, পৃ. ৩২৯

৮৭. আল-কুরআন, ৩ : ২৮

৮৮. আল-কুরআন, ২০ : ১১৫

নবী স. বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

নিশ্চয় মহান আল্লাহ আমার উম্মাতের ত্রুটি-বিস্মৃতি এবং যে কাজ করতে বাধ্য করা হয় তা ক্ষমা করে দেন।[৮৯]

যে ভুলের সাথে মানুষের ইচ্ছার কোনো সম্পর্ক নেই সেই ভুলের জন্য মহান আল্লাহ মানুষকে ধরপাকড় করবেন না, বরং তা ক্ষমা করার ইঙ্গিত কুরআন মাজীদে পাওয়া যায়:

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾

হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদের পাকড়াও করো না।[৯০]

আল্লামা ইবন নুজাইম রহ. বলেন, ফিক্‌হ শাস্ত্রের মূলনীতি হলো, বাস্তবায়ন করা অত্যাবশ্যক এমন কোনো কাজ ভুলের কারণে পরিত্যক্ত হলে কিংবা নিষিদ্ধ কোনো কাজ বাস্তবায়িত হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পাপ রহিত হয়ে যাবে।[৯১]
তিনি আরো বলেন, নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদত যদি কেউ ভুলবশত ত্যাগ করে, তবে সর্বসম্মত মত অনুযায়ী এগুলো কাযার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।[৯২]

এতদ বিষয়ক কতিপয় মাসআলা নিম্নরূপ :

ক. কোনো সিয়ামপালনকারী যদি ভুলবশত দিনের বেলা পানাহার কিংবা স্ত্রী সহবাস করে, তবে তার সিয়াম নষ্ট হবে না। এটা অধিকাংশ ফিক্‌হবিদের অভিমত।

দলীল : আবু হুরায়রা রা. বলেন, নবী স. বলেছেন:

إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

যে ব্যক্তি সিয়ামের কথা ভুলে পানাহার করবে, সে যেন সিয়াম পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহ-ই তাকে পানাহার করিয়েছেন।[৯৩]

খ. কোনো প্রাণি যবেহ করার সময় ভুলবশত বিসমিল্লাহ বলা ত্যাগ করলে ঐ প্রাণির গোশত খাওয়া বৈধ হবে, তবে স্বেচ্ছায় বিসমিল্লাহ ত্যাগ করলে ঐ প্রাণির গোশত খাওয়া বৈধ হবে না। এটি ইমাম আবু হানীফা রহ. ও তাঁর দুই সহচরের (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ) অভিমত।[৯৪]

---

৮৯. ইমাম ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আত-তালাক, পরিচ্ছেদ : তালাকুল মুকরাহ ওয়ান-নাসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯৯, হাদীস নং-২০৪৫

৯০. আল-কুরআন, ২ : ২৮৬

৯১. ইবন নুজাইম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪০

৯২. প্রাগুক্ত

৯৩. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আস-সাওম, পরিচ্ছেদ : আস-সায়িমু ইযা আকালা আও শারিবা নাসিয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১, হাদীস নং-১৯৩৩

৯৪. ইবনুল হুমাম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২২, পৃ. ৩৫; ইবন কুদামা, *প্রাগুক্ত*, খ. ২১. পৃ. ২৮৫

দলীল : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾

যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি তার কিছুই তোমরা আহার করবে না, তা অবশ্যই পাপ।[৯৫]

গ. ইহরাম অবস্থায় কেউ যদি ভুলবশত স্ত্রী সহবাস করে, তবে তার বিধান স্বেচ্ছায় স্ত্রী সহবাসকারীর ন্যায় হবে অর্থাৎ ভুলবশত স্ত্রী সহবাস করলেও তার হজ্জ উমরা বাতিল হয়ে যাবে। এটা হানাফী আলিমগণের অভিমত।

দলীল : হানাফী আলিমগণ যুক্তি দিয়ে বলেন, হজ্জ বা উমরা বাতিল হওয়ার বিধানটি সুনির্দিষ্টভাবে স্ত্রী সহবাসের সাথে সংশ্লিষ্ট, কাজেই তা ভুলবশত সম্পাদিত হওয়ার কারণে উক্ত বিধান রহিত হবে না। তা ছাড়া ইহরাম অবস্থায় থাকাকালীন সময়ে মুহরিম ব্যক্তি এমন পোশাক পরা অবস্থায় থাকে যে, তাকে সর্বদা হজ্জের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কাজেই এখানে ভুলের ওযরটি মূল বিধানে কোনো প্রভাব ফেলবে না।[৯৬]

৫. অজ্ঞতা

বৈধ-অবৈধের জ্ঞান না থাকার কারণে কোনো ব্যক্তি যদি অজ্ঞতাবশত শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজ করে, ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী এ কাজের জন্য তার পাপ হবে না।[৯৭]

অজ্ঞতার কারণে রুখসাত সম্বলিত কতিপয় মাসাআলা

ক. নাপাক অবস্থায় নামায পড়া সর্বসম্মতভাবে নিষিদ্ধ। তবে কেউ যদি নাপাক অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে নামায আদায় করে, তবে তার গুনাহ হবে না।[৯৮]

খ. সিয়াম রাখা অবস্থায় স্বেচ্ছায় পানাহার কিংবা সহবাস করা সিয়াম ভঙ্গের কারণ এবং এতে কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হয়। তবে কোনো সিয়ামপালনকারী ব্যক্তি যদি উপর্যুক্ত বিষয়ের বিধান অজ্ঞ থাকা অবস্থায় তা সম্পাদন করে তবে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না, শুধু কাযা করলেই সে দায়িত্ব মুক্ত হবে।[৯৯]

গ. ব্যভিচার করা নিষিদ্ধ-এ বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা অবস্থায় যদি কেউ ব্যভিচার করে, তবে তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে না। এ ব্যাপারে উমর, উসমান ও আলী রা. বলেছেন: "যে ব্যক্তি ব্যভিচারের অবৈধতার বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ, সে ব্যভিচার লিপ্ত হলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না।"[১০০]

---

৯৫. আল-কুরআন, ৬ : ১২১
৯৬. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৪২
৯৭. ইবন নুজাইম, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩৪০
৯৮. ইমাম আন-নাবাবী, *আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব*, বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, তা. বি., খ. ২, পৃ. ৬৭
৯৯. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩১
১০০. ইবন কুদামা, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ২০৮

উল্লেখ্য যে, যে ব্যক্তি নওমুসলিম বা মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এমন কোনো জনপদে বাস করে, যেখানে এতদবিষয়ের মাসআলা জানার সুযোগ নেই তার অজ্ঞতার বিষয়টি বিবেচনাযোগ্য। পক্ষান্তরে যারা মুসলিম সমাজে বসবাস করে তার এতদবিষয়ে অজ্ঞতা বিবেচনাযোগ্য নয়।[১০১]

৬. সৃষ্টিগত দুর্বলতাজনিত কারণে

সৃষ্টিগত দুর্বলতা ও শারীরিক অক্ষমতার বিষয় বিবেচনায় রেখে শরীয়ত রুখসাতের ব্যবস্থা রেখেছে। এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হলো :

ক. ইসলামী জীবনব্যবস্থায় ইবাদতে নারী-পুরুষের বৈষম্য রাখা হয়নি। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾

পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেউ সৎকাজ করলে ও মুমিন হলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণও জুলম করা হবে না।[১০২]

তবে সৃষ্টিগত কারণে নারী সমাজ দুর্বল হওয়ায় শরীয়তে তাদের কতিপয় বিষয়ে রুখসাত দেয়া হয়েছে, যা পুরুষ সমাজকে দেয়া হয়নি। যেমন, নারীদের জন্য জামাআতে নামায আদায়, জুমুআর নামায, দুই ঈদের নামায ও জিহাদে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়নি অথচ তা পুরুষের জন্য বাধ্যতামূলক। এছাড়াও নারী জাতির কতিপয় সমস্যা বিবেচনায় রেখে রুখসাতের বিধান রাখা হয়েছে, যা পুরুষের,ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন- ঋতুমতী ও প্রসূতি নারীর জন্য নামায মওকুফ হওয়া ও রমযানের সিয়াম পরবর্তী কোনো সময় রাখার রুখসাত ইত্যাদি। এ ছাড়া রেশমের কাপড় পরিধান ও স্বর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারী সমাজের জন্য রুখসাতের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

দলীল : তারিক ইবন শিহাব রা. বলেন, নবী স. বলেছেন:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ

চার শ্রেণির লোক ব্যতীত সকল মুসলিমের জন্য জামাআতের সাথে জুমুআর নামায আদায় করা ফরয। ঐ চার শ্রেণির লোক হলোঃ কারো মালিকানাধীন দাস, নারী, শিশু ও অসুস্থ ব্যক্তি।[১০৩]

নারীদের উপর জুমআর নামায আবশ্যিক না হওয়ার ব্যাপারে সকল ফিক্হবিদের ঐকমত্য রয়েছে, তবে তারা যদি জুমুআর নামায আদায় করে তাহলে তা আদায় হয়ে

---

১০১. *প্রাগুক্ত*

১০২. আল-কুরআন, ৪ : ১২৪

১০৩. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আস সালাত, পরিচ্ছেদ : আল জুমুরাতু লিল-মামলূক ওয়াল মারয়াতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০২, হাদীস নং-১০৬৯

যাবে এবং তাদের যুহরের নামায পড়তে হবে না।[১০৪] অনুরূপভাবে জুমআর নামাযের ন্যায় নারীদের জন্য দুই ঈদের নামাযেও উপস্থিত হওয়া জরুরী নয়।[১০৫]

জিহাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে রুখসাতের বিধান রাখা হয়েছে। 'আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلا نُجَاهِدُ قَالَ لا لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ

হে আল্লাহর রাসূল! আমরা (নারী সমাজ) জিহাদকে উত্তম আমল মনে করি, এমতাবস্থায় আমরা কি জিহাদে অংশগ্রহণ করবো না? রাসূলুল্লাহ স. বলেন, না। বরং (তোমাদের জন্য) উত্তম জিহাদ হলো, কবুল হজ্জ।[১০৬]

ঋতুমতী ও প্রসূতি নারীর নামায মওকুফ হওয়ার এবং রমযানের সিয়াম অন্যসময় রাখার ব্যাপারে শরীআত রুখসাতের ব্যবস্থা রেখেছে। আবু সাঈদ আল-খুদরী রা. বলেন, নবী স. নারীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন :

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا

তোমাদের কারো ঋতুস্রাব হলে সে কি নামায ও সিয়াম ছেড়ে দেয় না? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটাই তার দীন সংক্রান্ত ঘাটতি।[১০৭]

৭. কষ্টসাধ্যতা

শরীয়তের বিধানে রুখসাত প্রবর্তনের অন্যতম কারণ হলো, কাজের কষ্টসাধ্যতা লাঘব করার ব্যবস্থা খুঁজে বের করা।

ক. যে সকল নাপাকী থেকে মুক্ত থাকা কষ্টকর তা সহ নামায আদায় করার বৈধতা। যেমন জখমের রক্ত, ক্ষতস্থানের রক্ত ইত্যাদি।[১০৮]

খ. প্রবল বৃষ্টি, প্রচণ্ড শীত, অসুস্থতা, জান-মাল বিপন্ন হওয়ার আশংকা ইত্যাদি কারণে নামাযের জামা'আতে অংশ গ্রহণ না করার রুখসাত রয়েছে।[১০৯]

গ. তীব্র ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর ব্যক্তির নিরুপায় অবস্থায় মৃত প্রাণির গোশত খাওয়ার ব্যাপারে রুখসাত রয়েছে।

---

১০৪. ইবন কুদামা, *প্রাগুক্ত*, খ, ৪, পৃ. ১৮০

১০৫. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৮০

১০৬. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-হাজ্জ..., পরিচ্ছেদ : ফাদলুল হাজ্জিল মাবরূর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০, হাদীস নং-১৫২০

১০৭. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-হায়দ, পরিচ্ছেদ : তারকুল হায়দ আস-সাওম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬, হাদীস নং-৩০৪

১০৮. ইবন নুজাইম, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৪১

১০৯. প্রাগুক্ত

উপসংহার

ইসলাম সর্বজনীন জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মানুষের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। ইসলামী শরীয়তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, সহজতা প্রতিষ্ঠা করা এবং কাঠিন্য দূর করা। ইসলামী শরীয়ত কোন কঠিন বিধানই দেয় না; বরং মানুষের সমস্যা বিবেচনায় এনে নমনীয় বিধান দেয় তা প্রমাণ করে দেখানো হয়েছে। এ বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে মতবিরোধপূর্ণ মাসআলায় অপেক্ষাকৃত সহজ বিধানকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, তবে উপস্থাপিত প্রতিটি বিষয়ই কুরআন-হাদীস ও ফিক্‌হবিদগণের মতামতের আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ প্রবন্ধটি এতদবিষয়ে আরও অধিক গবেষণার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৩৯
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১৪

আবাসগৃহে প্রবেশাধিকার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

ড. আহমদ আলী*

[সারসংক্ষেপ : অন্ন-বস্ত্রের মতো বাসস্থানও মানবজাতির জন্য একটি মৌলিক প্রয়োজনীয় উপকরণ। তদুপরি এটি মানব সভ্যতার একটি বড় নিদর্শনও বটে। প্রত্যেক মানুষেরই বসবাসের জন্য আবাসস্থলের দরকার হয়। আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবীতে প্রত্যেকের জন্য বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তা মালিকানাধীন হোক কিংবা ভাড়া করা হোক। আবাসস্থলের আসল উদ্দেশ্যই হলো শান্তি ও নিরাপদে অবস্থান। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾ -"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গৃহে তোমাদের জন্য শান্তি ও নিরাপদ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।" (আল-কুরআন, ১৬ : ৮০) এই শান্তি ও নিরাপত্তা তখনই অক্ষুণ্ন থাকতে পারে, যখন মানুষ অন্য কারো হস্তক্ষেপ ব্যতীত নিজ গৃহে প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ ও বিশ্রাম করতে পারে। তার এ স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা গৃহের আসল উদ্দেশ্যকে পণ্ড করে দেয়ার নামান্তর। ইসলাম একটি বাস্তবধর্মী ও সর্বজনীন জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রত্যেকের নিরাপদ আবাসনের সুব্যবস্থা করেছে। মানুষেরা যাতে নিজ নিজ গৃহে স্বাধীন ও নির্বিঘ্নভাবে কাজ ও বিশ্রাম করতে পারে, সে জন্য ইসলাম বিভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে, যা যথাযথভাবে পালন করা হলে আমরা পারিবারিক ও সামাজিকভাবে অনেক জটিলতা থেকে মুক্তি পেতে পারি। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে নিরাপদ ও স্বাধীন আবাস প্রতিষ্ঠায় ইসলামের বিভিন্ন নির্দেশনা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।]

ভূমিকা

নিরাপদ ও স্বাধীন আবাস মানুষের একটি মৌলিক প্রয়োজন। যুগে যুগে ও দেশে দেশে মানুষ এ প্রয়োজন অনুভব করেছে এবং এতদুদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন সময় নানা বিধি-বিধানও প্রণয়ন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ (UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS [UDHR])-এর ১২ নং ধারায় গৃহের নিরাপত্তার স্বীকৃতি দান করা হয়।[১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের -এর

---

* অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

১. Article-12 : No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour

সংবিধানের ৪৩ নং ধারায়ও গৃহের নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।[২] ইসলাম একটি বাস্তবধর্মী ও স্বভাবসম্মত জীবন ব্যবস্থা হিসেবে তার একটি মৌলিক লক্ষ্য হলো মানুষের জন্য নিরাপদ ও স্বাধীন আবাস প্রতিষ্ঠা করা। মানুষেরা যাতে নিজ নিজ গৃহে পূর্ণ নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার সাথে বিচরণ করতে পারে এবং নির্বিঘ্নে বিশ্রাম নিতে পারে সে জন্য আল্লাহ তা'আলা কারো গৃহে প্রবেশ করার সময় ভদ্রজনোচিতভাবে অনুমতি গ্রহণের এবং বিনা অনুমতিতে প্রবেশ না করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ - لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾

হে মু'মিনগণ! তোমাদের নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত অনুমতি গ্রহণ না করো এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না করো। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা সদুপদেশ পেতে পারো। যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করো না। যদি তোমাদের বলা হয়, ফিরে যাও, তবে ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য পবিত্রতম কর্মনীতি। আর তোমরা যা করো আল্লাহ্ তা ভালোভাবেই জানেন। যে সব ঘরে কেউ বাস করে না, উপরন্তু সেখানে তোমাদের কোনো ভোগের সামগ্রীও রয়েছে, এমন ঘরে প্রবেশ করতে তোমাদের কোনো পাপ নেই। তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো আর যা গোপন রাখো, সব বিষয়ই আল্লাহ্ তা'আলা জানেন।[৩]

---

and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks. Tuhin Malik Compiled, *Manual on HUMAN RIGHTS LAW*, Dhaka : Legal Education and Training Institute, Bangladesh Bar Council, Third Edition, 2000, p. 81; Dr. Mizanur Rahman Edited, *HUMAN RIGHTS Summer Sehool Manual*, Dhaka : Human Rights Summer School, 2000, p. 178; www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a12, Date : 23.09.2014

২. বাংলাদেশ সংবিধানের ৪৩ নং ধারা- গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ :
রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের
(ক) প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক হইতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তালাভের অধিকার থাকিবে; এবং
(খ) চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনতা রক্ষার অধিকার থাকিবে।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, আইন, বিচার ও সংসদ বিসয়ক মন্ত্রণালয়, অক্টোবর, ২০১১, পৃ. ১২

৩. আল-কুরআন, ২৪ : ২৭-২৯

আমীরুল মু'মিনীন 'উমার রা. গৃহের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ব্যাহতকারীদের জন্য শাস্তির বিধান প্রণয়ন করেন। বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি এশার পর জনৈক লোকের ঘরে চাটাই জড়ানো অবস্থায় এক ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে তাকে একশ'টি বেত্রাঘাত করেছিলেন।[৪]

নিম্নে গৃহের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইসলামের নির্দেশিত বিধানসমূহ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হলো-

ক. পরগৃহে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করা

অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে হঠাৎ প্রবেশ করলে গৃহবাসীর অধিকার ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। অপর দিকে অনুমতি সাপেক্ষে কারো ঘরে প্রবেশ করলে ঘরের অধিবাসীদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন থাকে। উপরন্তু, তারা আগন্তুকের প্রয়োজন মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারে এবং তা পূরণে সচেষ্ট হতে পারে। পক্ষান্তরে অনুমতি না নিলে মনে ক্ষোভের সঞ্চার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ঘরে মেয়েরা অনেক সময় অসতর্ক অবস্থায় বিচরণ করে। বিনা অনুমতিতে কেউ প্রবেশ করলে উভয় পক্ষকে বিব্রত হতে হয়। তা ছাড়া আগন্তুকের মনে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করলে এ বিব্রতকর অবস্থা হতে মুক্ত থাকা যায়।

ঘরের নির্জনতায় মানুষ কখনো এমন অবস্থায় থাকে, যা সে অন্য কারো কাছে প্রকাশ পাওয়া পছন্দ করে না। এ ছাড়া অনেক সময় ঘরের পরিবেশ এমন অগোছালো থাকে, যা মেহমানের জন্য শোভনীয় নয়। সুযোগ পেলেই ঘরের মালিক সাবধানতা অবলম্বন করে সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশে আনন্দচিত্তে তাকে ঘরে আনতে পারে। অনুমতি না নিলে মুখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেও অন্তরে অসন্তুষ্টি বিরাজ করে।

ক. ১. অনুমতি প্রার্থনা করা ওয়াজিব

ইসলামী আইনে অন্য কারো গৃহে প্রবেশের পূর্বে নারী-পুরুষ, মাহরাম ও গায়র-মাহরাম নির্বিশেষে সকলেরই অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব। অনুমতি ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করার অধিকার কারো নেই। চাই ঘরের দরজা খোলা থাকুক কিংবা বন্ধ থাকুক, চাই ঘরে কেউ থাকুক বা না-ই থাকুক, সর্বাবস্থায় অনুমতি নিয়েই পরগৃহে প্রবেশ করতে হবে। কারণ ঘরের কিছু বাধা-নিষেধ (restriction) রয়েছে, যা

---

৪. আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ*, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩ হি., খ. ৭, পৃ. ৪০১, হাদীস নং-১৩৬৩৮

عن محمد بن راشد قال سمعت مكحولا فحدث أن رجلا وجد في بيت رجل بعد العتمة ملففا في حصير فضربه عمر بن الخطاب مئة

লঙ্ঘন করা জায়িয নয়। তদুপরি অনুমতি প্রার্থনার বিধান কেবল ঘরের অধিবাসীদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই প্রণয়ন করা হয় নি; বরং তাতে ঘরের অধিবাসীদের প্রতি যেমন লক্ষ্য রাখা হয়েছে, তেমনি তাদের ধন-সম্পদের গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। লোকেরা যেমন ঘরকে আত্মরক্ষার উপকরণ হিসেবে গড়ে তোলে, তেমনি তাকে সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্র হিসেবেও তৈরি করে। তারা যেমন নিজের গোপনীয় ব্যাপারাদি অপরকে অবহিত করতে অপছন্দ করে, তেমনি তারা নিজের ধন-সম্পদও অপরের কাছে প্রকাশ করতে চায় না।[৫] বিশিষ্ট তাবি'ঈ 'আতা [২৭-১২৪ হি.] রহ. বলেন, "পরগৃহে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করা প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের ওপর ওয়াজিব।"[৬] মালিকী মতাবলম্বী ইমামগণ বলেন, "কেউ যদি অন্যের বাড়িতে প্রবেশের জন্য অনুমতি চাওয়ার বিধানকে অস্বীকার করে, সে কাফির হয়ে যাবে। কারণ সে প্রকারান্তরে দীনের একটি সুস্পষ্ট বিধানকেই অস্বীকার করলো।"[৭]

উপর্যুক্ত আয়াতে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا বলে মু'মিন পুরুষদেরকে সম্বোধন করা হলেও নারীরাও এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। সাহাবীগণের স্ত্রীরাও এ আয়াতের নির্দেশের আলোকে অনুমতি গ্রহণের বিধান মেনে চলতেন। উম্মু ইয়াস রা. বলেন, "আমরা চারজন মহিলা প্রায়ই উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা রা.-এর ঘরে যেতাম। প্রথমে আমরা তাঁর নিকট অনুমতি চাইতাম। তিনি অনুমতি দিলে আমরা ভেতরে প্রবেশ করতাম।"[৮]

পরগৃহের মতো নিজের ভাড়া দেয়া গৃহেও প্রবেশ করতে হলে ভাড়ায় অবস্থানকারী গৃহবাসীদের নিকট অনুমতি চাইতে হবে। বিনা অনুমতিতে সেখানে প্রবেশ করা জায়িয নেই।[৯] ইমাম আবূ ইউসূফ [১১৩-১৮২ হি.] ও ইমাম মুহাম্মাদ [১৩১-১৮৯ হি.] রহ. প্রমুখের মতে, যদি ভাড়াটিয়া অনুমতি নাও দেয়, তবুও ঘরের অবস্থা দেখা

---

৫. 'আলাউদ্দীন কাসানী, *বাদা'য়িউছ ছানা'ই*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'আরবী, ১৯৮২, খ. ৫, পৃ. ১২৪

৬. আবুল ফাদ্ল শিহাবুদ্দীন আল-আলূসী, *রূহুল মা'আনী*, বৈরূত : দারু ইহয়াতিত তুরাছিল আরবী, ১৯৮৫, খ. ১৮, পৃ. ১৩৫

৭. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ূনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯০, খ. ৩, পৃ. ১৪৭ (সূত্র: *তাফসীরুল কুরতুবী*, খ. ১২, পৃ. ২১৯; *আহকামুল কুরআন*, খ. ৩, পৃ. ৩৮৬; *আশ-শারহুস সাগীর*, খ. ৪, পৃ. ৭৬২; *শারহুল কাফী*, খ. ২, পৃ. ১১৩২; *আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী*, খ. ২, পৃ. ১৪৬)

৮. ইবনু আবী হাতিম, *আত-তাফসীর*, ছায়দা : আল-মাকতাবাতুল 'আসারিয়্যাহ, হাদীস নং-১৪৩৬২; আবুল ফাদ্ল শিহাবুদ্দীন আল-আলূসী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৮, পৃ. ১৩৫

كنت في أربع نسوة نستأذن على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت : ندخل فقالت : لا فقال واحد : السلام عليكم أندخل قالت : ادخلوا ثم قالت يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم الخ

৯. ড. আবদুল কারীম যায়দান, *আল-মুফাছ্ছাল ফী আহকামিল মার'আতি*, বৈরূত : মু'আসসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৭, খ. ৩, পৃ. ৪৮৮

ও মেরামত করার উদ্দেশ্যে ঘরের মালিকের ভেতরে প্রবেশ করার অধিকার থাকবে। তবে ইমাম আবূ হানীফাহ [৮০-১৫০ হি.] রহ.-এর মতে, ভাড়াটিয়ার সম্মতি লাভ করা ছাড়া মালিকের ঘরে প্রবেশের অধিকার থাকবে না।"[১০]
উল্লেখ্য যে, নিম্ন আওয়াজে অনুমতি প্রার্থনা করা মুস্তাহাব। তবে তা এতোটুকু পরিমাণ স্পষ্ট হওয়া দরকার, যাতে গৃহবাসী শুনতে পায়। তবে কর্কশ আওয়াজে বা চিৎকার করে অনুমতি চাওয়া উচিত নয়।[১১]

ক. ২. অনুমতি লাভ করার জন্য ঘরের লোকদেরকে সালাম ও প্রীতি বিনিময় করা

অনুমতি গ্রহণের জন্য দুটি কাজ না করে কারো ঘরে প্রবেশ করা ঠিক নয়। প্রথমত, প্রীতি বিনিময় করা বা অনুমতি প্রার্থনা করা। মূলত ঘরে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি চাওয়া দ্বারা ঘরের মালিকের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয় এবং আগন্তুকের প্রতি আতঙ্ক দূরীভূত হয়। দ্বিতীয়ত, ঘরের লোকদেরকে সালাম করা। ইমাম আবূ যাকারিয়া আন-নাবাবী [৬৩১-৬৭৬ হি.] রহ. বলেন, সুন্নাত হলো সালাম করা ও তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করা।[১২] ইমাম ইবনু রুশদ আল-কুরতুবী আল-মালিকী [৫২০-৫৯৫ হি.] রহ. বলেন, প্রথমে অনুমতি প্রার্থনা করবে। তারপর সালাম করবে।[১৩] বিশিষ্ট মুফাসসির আবূ 'আবদুল্লাহ আল-কুরতুবী [মৃ.৬৭১ হি.] রহ.-এর মতে, প্রথমে অনুমতি নিয়ে পরে ঘরে প্রবেশের সময় সালাম করবে।[১৪] ইমাম আবুল হাসান আল-মাওয়ার্দী [৩৬৪-৪৫০হি.] রহ. বলেন, যদি অনুমতি নেয়ার পূর্বে ঘরের কোনো ব্যক্তির সাথে দেখা হয়, তবেই প্রথমে সালাম করবে। এরপর অনুমতি চাইবে। দেখা না হলে প্রথমে অনুমতি চাইবে। অনুমতি পাওয়া গেলে ঘরে প্রবেশের সময় সালাম করবে।[১৫]

কিন্তু বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, বাহির থেকে প্রথমে সালাম করতে হবে। তারপর নিজের নাম উচ্চারণ করে বলবে যে, অমুক সাক্ষাত করতে চায়। সাইয়িদুনা রিব'ঈ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ স. একটি ঘরে অবস্থান

---

১০. ইবনু 'আবিদীন, *হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার*, বৈরূত : দারুল ফিকর, ২০০০, খ. ৬, পৃ. ১৯৯
১১. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত*, প্রবন্ধ : ইস্তি'যান, খ. ৩, পৃ. ১৫১
১২. ইয়াহয়া ইবনু শারফ আন-নাবাবী, *শারহু সাহীহি মুসলিম*, দিল্লী : কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ, তা.বি., খ. ২, পৃ. ২১০
১৩. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, ইস্তি'যান, খ. ৩, পৃ. ১৪৬ (সূত্র : *আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী*, খ. ২, পৃ. ৪৬৭; *আশ-শারহুস সাগীর*, খ. ৪, পৃ. ১৮৬)
১৪. ইমাম আল-কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন*, রিয়াদ : দারু 'আলামিল কুতুব, ২০০৩, খ. ১২, পৃ. ২১৯
১৫. হাফেজ মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, পরগৃহে প্রবেশের ইসলামী পদ্ধতি, *অগ্রপথিক*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বর্ষ : ১৪, সংখ্যা : ২, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯, পৃ. ১২০

করছিলেন। এমতাবস্থায় বানূ 'আমির গোত্রের জনৈক ব্যক্তি এসে ঘরের বাইরে থেকে বললো, আমি কী ঢুকতে পারবো? তখন রাসূলুল্লাহ স. তাঁর খাদিম আনাস রা.কে বললেন, লোকটি অনুমতি চাওয়ার নিয়ম জানে না। বাইরে গিয়ে তাকে নিয়ম শিখিয়ে দাও। সে প্রথমে বলবে, আসসালামু 'আলাইকুম। তারপর বলবে, আমি কী প্রবেশ করতে পারি? লোকটি বাইরে থেকে রাসূলুল্লাহ স.-এর কথা শুনে বললো, "আসসালামু 'আলাইকুম। আমি কী প্রবেশ করতে পারি?" তখন রাসূলুল্লাহ স. তাকে অনুমতি দান করলেন। এরপর লোকটি ভেতরে প্রবেশ করলো।[১৬]

সাইয়িদুনা কালাদাহ ইবনু হাম্বাল রা. থেকেও বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার সাফওয়ান ইবনু উমাইয়াহ রা. ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁকে সামান্য দুধ ও কয়েকটি শসা নিয়ে রাসূলুল্লাহ স.-এর খিদমাতে পাঠালেন। আমি তাঁর কাছে অনুমতি না চেয়ে এবং সালাম না করে ঢুকে পড়লাম। তখন রাসূলুল্লাহ স. বললেন, "তুমি ফিরে গিয়ে বলো, আসসালামু 'আলাইকুম। আমি কী প্রবেশ করতে পারি?"[১৭]

উপর্যুক্ত হাদীসসমূহের আলোকে ইসলামী আইনবিদগণ বলেন, প্রথম সালাম হচ্ছে অনুমতির বাক্য শ্রবণের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য। অনুমতি লাভের পর ঘরে প্রবেশের সময় যথারীতি পুনরায় সালাম করতে হবে।[১৮]

ক. ৩. অন্ধলোকেরও অনুমতি নিতে হবে

পরগৃহে প্রবেশ করার জন্য অন্ধলোককেও অনুমতি নিতে হবে। কারণ সে চোখে না দেখলেও কানে গোপন কথা শুনতে পারে।[১৯]

---

১৬. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : কাইফাল ইস্তি'যান, বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, হাদীস নং-৫১৭৯

عَنْ رِبْعِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِى عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ فِى بَيْتٍ فَقَالَ أَلِجُ فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- لِخَادِمِهِ « اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الاِسْتِئْذَانَ فَقُلْ لَهُ قُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ ». فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَدَخَلَ.

১৭. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : কাইফাল ইস্তি'যান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫১৭৮; ইমাম আত-তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ইস্তি'যান, পরিচ্ছেদ : আত-তাসলীম কাবলাল ইস্তি'যান, বৈরূত : ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, হাদীস নং-২৭১০

عَنْ كَلَدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِلَبَنٍ وَجِدَايَةٍ وَضَغَابِيسَ - وَالنَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- بِأَعْلَى مَكَّةَ - فَدَخَلْتُ وَلَمْ أُسَلِّمْ فَقَالَ « ارْجِعْ فَقُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ».

১৮. হাফেজ মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১

১৯. আবুল ফাদল শিহাবুদ্দীন আল-আলূসী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৮, পৃ. ১৩৫-৬; ড. আবদুল কারীম যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৪৯৩-৪

ক. ৪. অনুমতি ছাড়া পরগৃহে প্রবেশের বিশেষ অবস্থাসমূহ

যদি অনুমতি না নিয়ে পরগৃহে প্রবেশ করলে কারো প্রাণ কিংবা সম্পদ অথবা মান-সম্মান রক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, অপরদিকে অনুমতি চেয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা হলে কারো মৃত্যুবরণ করার বা নিহত হওয়ার অথবা সম্পদ খোয়া যাওয়ার বা নষ্ট হওয়ার বা মান-সম্মান হারানোর আশঙ্কা সৃষ্টি হয়, তা হলে অনুমতি ছাড়াই অন্যের ঘরে প্রবেশ করা জায়িয রয়েছে। ইসলামী আইনবিদগণ এ ধরনের কিছু ব্যাপার উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন,

১. যদি শত্রুরা কাউকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে কারো ঘরে চড়াও হয়ে যায়, এমতাবস্থায় গৃহবাসীকে রক্ষার জন্য অনুমতি ছাড়া তার ঘরে প্রবেশ করা জায়িয।
২. যদি কারো ঘরে চোর-ডাকাত ঢুকে পড়ে, তা হলে সেখানেও গৃহবাসী ও তার ধন-সম্পদকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা জায়িয।
৩. যদি কেউ কারো ঘরে কোনো কাপড় বা মূল্যবান বস্তু ভুলে রেখে চলে আসে, আর সে আশঙ্কা করছে যে, যদি ঘরের লোকেরা তা জানতে পারে, তা হলে তারা তা কুক্ষিগত করে ফেলবে। এমতাবস্থায় ফেলে যাওয়া বস্তুটি নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে অনুমতি ছাড়া ঘরে প্রবেশ করা জায়িয হবে।
৪. যদি কোনো অপরহরণকারী কারো কোনো বস্তু ছিনতাই করে তার নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে, এমতাবস্থায় বস্তুর মালিক তার ছিনিয়ে নেয়া বস্তুটি উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে অপরহরণকারীর ঘরে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করতে পারবে।
৫. যদি কারো ঘরে আগুন লাগে, তা হলে তাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সেখানে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা জায়িয হবে।
৬. যদি কেউ মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তা হলে তাকে দেখার জন্য বা সাহায্য করার জন্য অনুমতি ছাড়া তার ঘরে প্রবেশ করা জায়িয।
৭. ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. প্রমুখের মতে, যদি কেউ তার ঘর কাউকে ভাড়া দেয়, তা হলে ঘরের অবস্থা দেখা ও মেরামত করার উদ্দেশ্যে তার ভেতরে প্রবেশ করার অধিকার থাকবে, যদিও ভাড়াটিয়া অনুমতি না দেয়। তবে ইমাম আবূ হানীফাহ রহ.-এর মতে, ভাড়াটিয়ার সম্মতি লাভ করা ছাড়া মালিকের ঘরে প্রবেশের অধিকার থাকবে না।
৮. যুদ্ধাবস্থায় শত্রুরা কোনো ঘরে ঢুকে পড়লে সেখানে তাদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যোদ্ধাদের জন্য ঘরের মালিকের অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা জায়িয।[২০]

---

২০. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৪৮-৯, খ. ২৫, পৃ. ১২৮-৯ (সূত্র: *হাশিয়াতু ইবনি 'আবিদীন*, খ. ৫, পৃ. ১২৬; *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ. ৮, পৃ. ২৪)

৯. হানাফী ও মালিকী মতাবলম্বী ইমামগণের মতে, যদি কারো ঘরে কোনো জঘন্য অপকর্ম বা পাপাচার হতে দেখা যায় বা জানা যায় অথবা প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয়, তা হলে তা প্রতিরোধ করার মহৎ উদ্দেশ্যে সেখানে ঘরের মালিকের অনুমতি ছাড়া মুসলিম শাসক বা তাঁর প্রতিনিধির প্রবেশ করা জায়িয। যেমন- কারো ঘরে অবৈধ বাদ্যযন্ত্র বাজানো হচ্ছে, যদি তার আওয়াজ বাইরে শোনা যায় বা তা জানা যায়, তা হলে তা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সেখানে মুসলিম শাসক বা তাঁর প্রতিনিধির জন্য অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা জায়িয হবে। এর কারণ হলো,

প্রথমত ঘরে যখন অন্যায় ও পাপাচারের চর্চা হয়, তখন তার আর বাধা-নিষেধ (restriction) থাকে না। আর যখন তার বাধা-নিষেধ (restriction) বাতিল হয়ে যায়, তখন সেখানে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা জায়িয হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত, অন্যায়ের প্রতিরোধ করা ফারয। তাই এ ক্ষেত্রে যদি অনুমতি গ্রহণের শর্তারোপ করা হয়, তা হলে অন্যায়ের প্রতিরোধ করা দুষ্কর হয়ে পড়বে।

বর্ণিত রয়েছে, একবার 'উমার রা. কাতরতার সাথে বিলাপরত জনৈকা মহিলার ঘরে আকস্মিকভাবে প্রবেশ করে তাকে এমনভাবে বেত্রাঘাত করেছিলেন, যাতে তার ওড়না মাথা থেকে পড়ে গিয়েছিল। এরপর 'উমার রা. কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন যে,

لا حُرْمَةَ لَهَا بَعْدَ اشْتِغَالِهَا بِالْمُحَرَّمِ وَالْتَحَقَتْ بِالإِمَاء.

'হারাম কাজে লিপ্ত থাকার কারণে মহিলাটির আব্রু রক্ষার কোনো দায় নেই। তার অবস্থা দাসীদের অনুরূপ হয়ে গেছে।'[২১]

শাফি'ঈ মতাবলম্বী ইমামগণের মতে, যদি কেউ জানতে পারে যে, কোনো ঘরে মদ্য পানের আসর চলছে বা তানপুরা বাজানো হচ্ছে, তা হলে বিপর্যয় সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকলে সেখানে আকস্মিকভাবে প্রবেশ করে অপকর্ম প্রতিরোধ করার অধিকার রয়েছে। প্রয়োজনে বল প্রয়োগ করে বন্ধ করাও জায়িয।[২২] তাঁরা হানাফী ইমামগণের তুলনায় বিষয়টি একটু বেশি বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের মতে, অন্যায় যদি এ ধরনের হয়, যা তাৎক্ষণিকভাবে

---

২১. ইমাম আল-কুরতুবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৮, পৃ. ৭৫; ইবনু 'আবিদীন, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৬৫
পূর্ণ রিওয়ায়াতটি হলো-

روي أن عمر رضي الله تعالى بلغه نائحة في ناحية من المدينة فأتاها حتى هجم عليها في منزلها فضربها بالدرة حتى سقط خمارها فقيل له يا أمير المؤمنين أخمارها قد سقط فقال : إنه لا حُرْمَةَ لَهَا بَعْدَ اشْتِغَالِهَا بِالْمُحَرَّمِ وَالْتَحَقَتْ بِالإِمَاء .

২২. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, *প্রাগুক্ত*, খ. ২৫, পৃ. ১২৮-৯ (সূত্র: *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ. ৮, পৃ. ২৪)

দমন করতে হয়, পরে দমন করার সুযোগ না থাকে, তা হলে অনুমতি ছাড়াই ঘরে প্রবেশ করা বৈধ হবে। যেমন কেউ কোনো বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে জানতে পারলো যে, কোনো ঘরে এক লোক অন্য একজন লোককে হত্যা করার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছে অথবা কেউ কোনো মহিলার সাথে যিনা করার জন্য নির্জনে মিলিত হয়েছে, তবে লোকটিকে হত্যার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এবং মেয়েটির সম্ভ্রম রক্ষার জন্য গোপনে তাদের অবস্থা দেখা ও ঘরের ভেতরে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা বৈধ হবে। কারণ এমতাবস্থায় অনুমতির জন্য অপেক্ষা করা হলে অপরাধগুলো সংঘটিত হয়ে যাবে, পরে এগুলো প্রতিহত করার কোনো সুযোগ থাকবে না। আর যদি অন্যায় এ ধরনের হয়, যা তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিরোধ না করলেও পরে প্রতিরোধ করার বা বারণ করার সুযোগ থাকে অথবা যা ঘরে প্রবেশ না করেই প্রতিহত করা যায়, তা হলে অনুমতি ছাড়া ঘরে প্রবেশ করা বৈধ হবে না।[২৩]

ক. ৫. তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করা

কারো যদি ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করার পর মনে হয় যে, গৃহবাসী তার অনুমতি প্রার্থনা শোনতে পায় নি, তা হলে সে ততবারই অনুমতি প্রার্থনা করতে পারবে, যতক্ষণ তার এ ধারণা সৃষ্টি হবে না যে, গৃহবাসী তার অনুমতি প্রার্থনা শুনতে পেয়েছে। তবে অধিকাংশ 'আলিমের মতে, তিনবারের অধিক অনুমতি প্রার্থনা করা সমীচীন নয়।[২৪]

আবূ মূসা আল-আশ'আরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ

তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও যদি অনুমতি পাওয়া না যায়, তাকে ফিরে আসা উচিত।[২৫]

ইমাম মালিক [৯৩-১৭৯ হি.] রহ.-এর মতে, তিনবারের চাইতেও বেশি অনুমতি প্রার্থনা করতে পারবে, যদি সে নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যে, গৃহবাসী তার অনুমতি

---

২৩. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৪৮-৯ (সূত্র: *হাশিয়াতুল কালয়ূবী*, খ. ৩, পৃ. ৩৩; *মা'আলিমুল কুরবাতি ফী আহকামিল হিসবাহ*, পৃ. ৩৭-৮)

২৪. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৫০ (সূত্র : *'উমদাতুল কারী*, খ. ২২, পৃ. ২৪১; *তাফসীরে আল-কুরতুবী*, খ. ১২, পৃ. ২১৪; *আশ-শারহুস সাগীর*, খ. ৪, পৃ. ৭৬২; *শারহুল কাফী*, খ. ২, পৃ. ১১৩৪; *হাশিয়াতু ইবনি 'আবিদীন*, খ. ৫, পৃ. ২৬৫)

২৫. ইমাম বুখারী, *আস-সাহীহ*, অধ্যায় : আল-ইস্তি'যান, পরিচ্ছেদ : আত-তাসলীম ওয়াল-ইস্তি'যান ..., বৈরূত : দারু ইবনি কাছীর, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., হাদীস নং-৫৮৯১; ইমাম মুসলিম, *আস-সাহীহ*, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : আল-ইস্তি'যান, বৈরূত : দারুল জীল ও দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, হাদীস নং-৫৭৫১

প্রার্থনা শুনতে পায় নি।[২৬] ইমাম আবূ যাকারিয়া আন-নাবাবী [৬৩১-৬৭৬ হি.] রহ. এ বিষয়ে অন্য একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন। তা হলো, যদি সালামের সাহায্যে অনুমতি প্রার্থনা করা হয়, তা হলে তিনবারের অধিক পুনরাবৃত্তি করবে না। আর যদি অন্য শব্দের সাহায্যে অনুমতি প্রার্থনা করা হয়, তা হলে তিনবারের অধিক পুনরাবৃত্তি করতে পারবে।[২৭]

উল্লেখ্য যে, একাধারে লাগাতার তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করবে না; বরং একবার অনুমতি চাওয়ার পর একজন আহাররত ব্যক্তি আহার শেষ করতে বা অযুরত ব্যক্তি অযু শেষ করতে বা নামায আদায়রত ব্যক্তি চার রাকআত নামায শেষ করতে যতক্ষণ সময় লাগে, ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করে আরেকবার অনুমতি চাইবে, যাতে গৃহবাসী এ ধরনের কোনো কাজে ব্যাপৃত থাকলে তা সম্পন্ন করার সুযোগ পায় আর যদি এ ধরনের কোনো কাজে ব্যাপৃত নাও থাকে, তা হলে সে যেন সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার অবকাশ লাভ করে।[২৮] রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

الاستئذان ثلاث ، فالأولى يستنصتون، والثانية يستصلحون، والثالثة: يأذنون أو يردون.

অনুমতি প্রার্থনা হলো তিনবার। প্রথমবার গৃহবাসী শুনবে। দ্বিতীয়বার তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। তৃতীয়বার হয়তো তারা অনুমতি দেবে অথবা ফিরিয়ে দেবে।[২৯]

ক. ৬. ফিরে যেতে বলা হলে অথবা ঘরে কাউকে পাওয়া না গেলে ফিরে যাওয়া উচিত

কারো ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাওয়ার পর যদি বলা হয়, এখন ফিরে যান, পরে দেখা করুন, তবে এতে মনে কষ্ট না নিয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে যাওয়া উচিত। একে খারাপ মনে করা, দরজায় বসে থাকা, অনুমতি অর্জনের জন্য পীড়াপীড়ি করা ও অকথ্য ভাষা ব্যবহার করা প্রভৃতি উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে যে,

﴿وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ﴾

যদি তোমাদেরকে বলা হয় যে, ফিরে যাও, তবে ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য পবিত্রতম কর্মনীতি।[৩০]

---

২৬. ড. আবদুল কারীম যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩. পৃ. ৪৯৭-৮

২৭. ইয়াহয়া ইবনু শারফ আন-নাবাবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২১০

২৮. ইবনু 'আবিদীন, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৪১৩

২৯. মুহাম্মাদ 'আবদুর রা'উফ আল-মুনাবী, *ফায়যুল কাদীর*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪, খ. ৩, পৃ. ২২৯; আবুল ফাদল আল-'ইরাকী, *আল-মুগনী 'আন হামলিল আসফার*, রিয়াদ : মাকতাবাহ তাবারিয়্যাহ, ১৯৯৫, খ. ১, পৃ. ৪৯১। হাদীসটির সানাদ দুর্বল।

৩০. আল-কুরআন, ২৪ : ২৮

আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আবূ মূসা আল-আশ'আরী রা. আমীরুল মু'মিনীন 'উমার রা.-এর কাছে অনুমতি লাভ করার জন্য বললেন, "আসসালামু 'আলাইকুম, আমি কী প্রবেশ করতে পারি?" 'উমার রা. মনে মনে বললেন, এটা প্রথম দফা। এরপর আবূ মূসা আল-আশ'আরী রা. কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বললেন, "আসসালামু 'আলাইকুম, আমি কী প্রবেশ করতে পারি?" এবার 'উমার রা. মনে মনে বললেন, এটা দ্বিতীয় দফা। এরপর আবূ মূসা আল-আশ'আরী রা. কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বললেন, "আসসালামু 'আলাইকুম। আমি কী প্রবেশ করতে পারি?" এবার 'উমার রা. মনে মনে বললেন, এটা তৃতীয় দফা। এরপর আবূ মূসা আল-আশ'আরী রা. ফিরে গেলেন। তখন 'উমার রা. দারওয়ানকে বললেন, দেখো তো লোকটি কী করলো? সে বললো, তিনি চলে গেছেন। 'উমার রা. বললেন, তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আবূ মূসা আসলে, 'উমার রা. তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, তুমি এ কী করলে? তিনি জবাব দিলেন, এটাই সুন্নাত (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসৃত রীতি)।[৩১]

অনুমতিপ্রার্থীর প্রতি এ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে ঘরের মালিকের প্রতি দৃষ্টি রেখে। কারণ, তার বিশেষ কোনো অসুবিধা থাকতে পারে। পক্ষান্তরে হাদীসে ঘরের মালিককে বলা হয়েছে যে, সাক্ষাতপ্রার্থী ব্যক্তিরও তোমার ওপর হক রয়েছে। তার হক হচ্ছে তাকে কাছে ডাকা, বাইরে এসে তার সাথে দেখা করা, তার কথা শোনা, তাকে ঘরে বসতে দেয়া, তার সম্মান করা, মেহমানদারি করা, একান্তই অসুবিধা না থাকলে তাকে ফিরিয়ে না দেয়া। যদি অনুমতি চাওয়ার পর দেখা যায় যে, ঘরে কেউ নেই অথবা অনুমতি দেয়ার মতো উপযুক্ত কেউ নেই, তা হলেও ঘরে প্রবেশ করা জায়িয হবে না; বরং ফিরে যাওয়া উচিত।

ক. ৭. উন্মুক্ত ঘরে প্রবেশ করার জন্য অনুমতির প্রয়োজন নেই

যে ঘরে কেউ বাস করে না, সেখানে প্রবেশের জন্য অনুমতির প্রয়োজন নেই। কারো ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতির বিধান নাযিল হওয়ার পর সাইয়িদুনা আবূ বাক্র আছ-ছিদ্দীক রা. রাসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করলেন, এতে কুরাইশ ব্যবসায়ীগণের

---

৩১. ইমাম আত-তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ইস্তি'যান, পরিচ্ছেদ : আল-ইস্তি'যান ছালাছাতুন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৬৯০

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ قَالَ عُمَرُ وَاحِدَةٌ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ قَالَ عُمَرُ ثِنْتَانِ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ فَقَالَ عُمَرُ ثَلَاثٌ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ لِلْبَوَّابِ مَا صَنَعَ قَالَ رَجَعَ قَالَ عَلَيَّ بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتَ قَالَ السُّنَّةُ

অসুবিধা হবে। কারণ, তারা সিরিয়া যাওয়ার সময় পথে সরাইখানাতে অবস্থান করে। এ সব ঘরে কোনো স্থায়ী বাসিন্দা নেই, এখানে কিভাবে অনুমতি নেবে? এ সময় নাযিল হয়- ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ﴾

> যে সব ঘরে কেউ বাস করে না, উপরন্তু সেখানে তোমাদের কোনো ভোগের সামগ্রী রয়েছে, এমন ঘরে প্রবেশ করতে তোমাদের কোনো পাপ নেই।[৩২]

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, মুসাফিরখানা, বিশ্রামাগার, মসজিদ, খানকা, জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, চিত্তবিনোদন কেন্দ্র, গণসৌচাগার, ধর্মীয় পাঠাগার, চিকিৎসাকেন্দ্র, দোকান-পাট এসব স্থানে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা যাবে।[৩৩] তবে যে সব স্থানে কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং টিকেট বা প্রবেশপত্র ছাড়া ঢোকার অনুমতি নেই, সেখানে অবশ্যই নিয়ম মোতাবেক প্রবেশ করতে হবে।

ক. ৮. ডাকার জন্য পাঠানো লোকের সাথে আসলে অনুমতির প্রয়োজন নেই

কাউকে লোক পাঠিয়ে ডাকা হলে সে ঐ লোকের সাথে চলে আসলে অনুমতির প্রয়োজন নেই। আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, যদি কোনো ব্যক্তিকে ডেকে পাঠানো হয় এবং সে ঐ লোকটির সাথে চলে আসে, তা হলে কি তারও অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে? তিনি বললেন, هو إذنه "তাকে ডেকে পাঠানোই হলো তাকে অনুমতি দান।"[৩৪] তবে পরে আসলে অনুমতি নিতে হবে অথবা সতর্কতামূলকভাবে অনুমতি নিলে ভালো। এ প্রসঙ্গে আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি একটি পেয়ালায় সামান্য দুধ দেখতে পেয়ে আমাকে বললেন, আবূ হুরাইরা! তুমি গিয়ে সুফফাবাসীদেরকে আমার দাওয়াত জানিয়ে এসো। আমি তাঁদের নিকট গিয়ে দা'ওয়াত পৌছালাম। পরে তাঁরা এসে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রাসূলুল্লাহ স. তাঁদেরকে অনুমতি দান করার পর তাঁরা ভেতরে ঢুকলেন।"[৩৫]

---

৩২. আল-কুরআন, ২৪ : ২৯

৩৩. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৪৭-৮ (সূত্রঃ *তাফসীরে কুরতুবী*, খ. ১২, পৃ. ২১১-২; *আহকামুল কুরআন*, খ. ৩, পৃ. ৩৮৭; *আশ-শারহুস সাগীর*, খ. ৪, পৃ. ৭৬১; *শারহুল কাফী*, খ. ২, পৃ. ১১৩৪; *আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী*, খ. ২, পৃ. ৪২৬; *'উমদাতুল কারী*, খ. ১২, পৃ. ১৩১; *বাদা'য়িউছ ছানা'ই*, খ. ৫, পৃ. ১২৫)

৩৪. ইমাম বুখারী, *আস-সাহীহ,* অধ্যায় : আল-ইস্তি'যান, পরিচ্ছেদ : ইযা দু'ইয়ার রাজুলু..., ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : আর-রাজুলু ইবা ইয়ুদ'আ..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫১৯১, ৫১৯২

৩৫. ইমাম বুখারী, *আস-সাহীহ,* অধ্যায় : আল-ইস্তি'যান, পরিচ্ছেদ : ইযা দু'ইয়ার রাজুলু..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৮৯২

ইমাম বাইহাকী রহ. বলেন, এ বিধান এমন ঘরের জন্য প্রযোজ্য হবে, যাতে কোনো ধরনের বাধা (restriction) নেই। আর যে সব ঘরে কোনো ধরনের বাধা আছে, সেখানে প্রবেশ করতে হলে অনুমতি নেয়া প্রয়োজন।[৩৬]

উপর্যুক্ত হাদীস থেকে জানা যায়, টেলিফোনের সংবাদের ভিত্তিতে আসলে তাকেও অনুমতি নিতে হবে।

ক. ৯. দরজা নক করে বা কড়া নেড়ে অনুমতি চাওয়া বৈধ

দরজা নক করে বা কড়া নেড়ে অনুমতি প্রার্থনা করা জায়িয। চাই দরজা বন্ধ হোক বা খোলা হোক। তবে কড়া এতো জোরে নাড়া উচিত নয়, যাতে ঘরের লোক চমকে ওঠে অথবা বিরক্তি বা কষ্ট অনুভব করে। এভাবে দরজা নকও অতি মৃদুভাবে হওয়া উচিত।[৩৭] আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَت أبواب رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم تُقرَعُ بِالأظَافِرِ.

রাসূলুল্লাহ স.-এর দরজাগুলো নখের সাহায্যে নক করা হতো।[৩৮]

নাফি' ইবনু 'আবদিল হারিছ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার বের হয়ে রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে একটি বাগানে গিয়ে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, দরজাটি টেনে ধরো। আর তিনি দরজা নক করলেন।[৩৯] জাবির ইবনু

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ فَقَالَ أَبَا هِرٍّ الْحَقْ أَهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَيَّ قَالَ فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا

৩৬. ইমাম আল-বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা,* মাক্কাহ : মাকতাবাতু দারিল বায, ১৯৯৪, খ. ৮, পৃ. ৩৪০; মুহাম্মাদ শামসুল হক 'আযীমাবাদী, *'আওনুল মা'বূদ,* বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৫ হি., খ. ১৪, পৃ. ৬৩

৩৭. ড. আবদুল কারীম যায়দান, *প্রাগুক্ত,* খ. ৩, পৃ. ৪৯৯-৫০০

৩৮. ইমাম বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ,* অধ্যায় : আল-ইস্তিযান, পরিচ্ছেদ : কার'উল বাব, বৈরূত : দারুল বাশায়ির আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খ্রি., হাদীস নং-১০৮০; ইমাম বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান,* পরিচ্ছেদ ১৫ : তা'যীমুন্নাবী সা..., বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি., হাদীস নং-১৪৩৭; বিশিষ্ট হাদীস গবেষক শায়খ আলবানী রহ. বলেন, হাদীসটি সাহীহ।

৩৯. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : আর-রাজুলু ইয়াস্তা'যিনু বিদ-দাক্কি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫১৯০

عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى دَخَلْتُ حَائِطًا فَقَالَ لِى « أَمْسِكِ الْبَابَ ». فَضُرِبَ الْبَابُ فَقُلْتُ « مَنْ هَذَا ». وَسَاقَ الْحَدِيثَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِى حَدِيثَ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَالَ فِيهِ فَدَقَّ الْبَابَ.

'আবদিল্লাহ রা. থেকেও বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার মৃত পিতার ঋণ সম্পর্কে আলাপ করার জন্য রাসূলুল্লাহ স.-এর দরবারে গিয়েছিলাম। আমি গিয়ে দরজার কড়া নাড়তেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি জবাব দিলাম, আমি। তিনি বললেন, আমি! আমি!। আমার মনে হলো যে, তিনি আমার এ উত্তর পছন্দ করেন নি।[৪০]

ক. ১০. কলিং বেল বা পরিচয় পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অনুমতি চাওয়া বৈধ

কলিং বেল বাজিয়ে অনুমতি চাওয়াও বৈধ। তবে কলিং বেল জোরো ও দীর্ঘ সময় ধরে বাজানো উচিত নয়; বরং মৃদুভাবেই বাজাবে[৪১] এবং অনুমতি প্রার্থনা করার মতোই কলিং বেল একবার বাজানোর পর একজন আহাররত ব্যক্তি আহার শেষ করতে বা অযুরত ব্যক্তি অযু শেষ করতে বা নামায আদায়রত ব্যক্তি চার রাক'আত নামায শেষ করতে যতক্ষণ সময় লাগে, ততক্ষণ সময় অপেক্ষা করে আরেকবার কলিং বেল বাজাবে। কলিং বেল বাজাবার সময় ভেতর থেকে পরিচয় জানতে চাইলে নামসহ পরিচয় দিতে হবে। পরিচয়পত্র প্রেরণের মাধ্যমেও অনুমতি চাওয়া বৈধ। পরিচয়পত্রে তো নাম উল্লেখ থাকবেই। এটা ভিন দেশীয় প্রথা হলেও এভাবে অনুমতি চাওয়ার লক্ষ্য সুন্দররূপে অর্জিত হয়।

ক. ১১. গলার শব্দ করে অনুমতি গ্রহণ করাও বৈধ

গলার শব্দ করে অনুমতি গ্রহণ করাও বৈধ। আবূ আইয়ূব আল-আনসারী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ স. কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা তো সালাম। আর অনুমতি গ্রহণ কী?[৪২] তিনি বললেন,

يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ : تَسْبِيحَةً ، وَتَكْبِيرَةً ، وَتَحْمِيدَةً ، وَيَتَنَحْنَحُ ، وَيُؤْذِنُ أَهْلَ الْبَيْت

অনুমতি প্রার্থী ব্যক্তিটি একবার 'সুবহানাল্লাহ' বা 'আল্লাহু আকবার' বা 'আল-হামদু লিল্লাহ' পড়বে এবং গলার শব্দ করবে এবং এভাবেই সে ঘরওয়ালাকে তার উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করবে।[৪৩]

---

৪০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ইস্তি'যান, পরিচ্ছেদ : ইযা কালা মান যা.., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৮৯৬; ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : আর-রাজুলু ইয়াস্তা'যিনু বিদ-দাক্কি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫১৮৯

عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهَا

৪১. ড. আবদুল কারীম যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫০০

৪২. আল্লাহ তা'আলার বাণী ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ - এর মধ্যে সালাম ব্যতীত যে অনুমতি গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

৪৩. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : আল-ইস্তি'যান, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা. বি., হাদীস নং-৩৭০৭

মালিকী ইমামগণের মতে, আল্লাহর নাম ব্যবহার করে যেমন 'সুবহানাল্লাহ' বা 'আল্লাহু আকবার' বা 'আল-হামদু লিল্লাহ' বা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে অনুমতি প্রার্থনা করা মাকরূহ। কেননা এমতাবস্থায় আল্লাহর নামকে যিক্‌র হিসেবে নয়; বরং অনুমতি গ্রহণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, যা তাঁর সাথে বেয়াদবি করার নামান্তর।[৪৪]

ক. ১২. অনুমতি প্রার্থনা করার সময় দরজার মুখোমুখি দাঁড়ানো উচিত নয়

অনুমতি চাওয়ার সময় যদি দরজা খোলা অবস্থায় থাকে, তা হলে অনুমতি প্রার্থী দরজার মুখোমুখি দাঁড়াবে না; বরং ডানে কিংবা বামে সরে দাঁড়াবে।[৪৫] আর যদি দরজা বন্ধ থাকে বা দরজায় পর্দা লাগানো থাকে, তা হলে যেখানে ইচ্ছা দাঁড়িয়ে অনুমতি প্রার্থনা করতে পারবে। তবে উত্তম হলো- এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করা, যাতে ঘরের ভেতরে দৃষ্টি না পড়ে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট মুফাসসির আবূ 'আবদিল্লাহ আল-কুরতুবী [মৃ. ৬৭১ হি.] রহ. বলেন,

> يجب عليه أن يأتي الباب ويحاول الإذن على صفة لا يطلع منه على البيت لا في إقباله ولا في انقلابه.
>
> ওয়াজিব হলো দরজার পাশে এসে এমন জায়গা থেকে অনুমতি প্রার্থনা করা, যা থেকে ঘরের অবস্থা দেখা যাবে না, সামনে থেকেও দেখা যাবে না, ফিরলেও দেখা যাবে না।[৪৬]

আবদুল্লাহ ইবনু বুস্‌র রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> كَانَ رَسُولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تلْقَاءِ وَجْهِه وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِه الأَيْمَنِ أَوِ الأَيْسَرِ وَيَقُولُ « السَّلاَمُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ». وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَئِذ سُتُورٌ.
>
> যখন রাসূলুল্লাহ স. কোনো ব্যক্তির ঘরের দরজায় গিয়ে পৌঁছতেন, তখন তিনি দরজার মুখোমুখি দাঁড়াতেন না; বরং তার ডান কি বাম পাশে সরে দাঁড়াতেন এবং দুবার আসসালামু আলাইকুম বলতেন। এর কারণ হলো, তখনকার ঘরের দরজাসমূহে পর্দা থাকতো না।[৪৭]

এ প্রসঙ্গে হুযাইল রা. থেকেও একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, একবার সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রা. রাসূলুল্লাহ স.-এর খিদমতে এসে দরজার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনুমতি প্রার্থনা করতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ স. তাঁকে বললেন,

---

৪৪. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৫০ (সূত্রঃ *আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী*, খ. ২, পৃ. ৪২৭)

৪৫. ড. আবদুল কারীম যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫০০

৪৬. ইমাম আল-কুরতুবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১২, পৃ. ২২০

৪৭. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : কাম মাররাতান ইয়ুসাল্লিমুর রাজুলু..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫১৮৮

هَكَذَا عَنْكَ أَوْ هَكَذَا فَإِنَّمَا الاسْتِئْذَانُ مِنَ النَّظَرِ.

তোমার পক্ষ থেকে এরূপ আচরণ! অনুমতি চাওয়ার বিধান তো এজন্যই যে, ভেতরে যেন চোখ না পড়ে।[৪৮]

আমীরুল মু'মিনীন উমার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَنْ مَلأَ عَيْنَيْهِ مِنْ قَاعَةِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَدْ فَسَقَ

যে ব্যক্তি অনুমতি দেয়ার আগে ঘরের ভেতরে দৃষ্টি দিলো, সে পাপ করলো।[৪৯]

ক. ১৩. পরিচয় পেশ করার সময় সুস্পষ্টভাবে নাম উল্লেখ করা বা পরিচয় প্রদান করা

ঘরে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি প্রার্থনার সময় অথবা ভেতর থেকে পরিচয় জানতে চাইলে সুস্পষ্টভাবে নিজের নাম বলতে হবে অথবা পরিচয় দিতে হবে। জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ্ রা.-এর বর্ণনা[৫০] থেকে জানা যায় যে, পরিচয় জানতে চাইলে স্পষ্টভাবে নাম না বলা বা 'আমি' বলা বা চুপ করে থাকা সমীচীন নয়। উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারগণ বলেছেন, 'আমি' শব্দ থেকে কোনো ধরনের স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় না। পরিচয় জানতে চাইলে নাম বলা উচিত। তবে যদি কেউ 'আমি অমুক' বলে উত্তর দেয়, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। বর্ণিত আছে, একবার উম্মু হানী রা. রাসূলুল্লাহ্ স.-এর নিকট প্রবেশ করতে চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ স. তাঁর পরিচয় জানতে চেয়ে বললেন, ইনি কে? তখন উম্মু হানী রা. বলেন, 'আমি উম্মু হানী'।[৫১] উল্লেখ্য, প্রয়োজনে পরিচয় স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে নিজের পদ ও মর্যাদার কথা উল্লেখ করা দূষণীয় নয়, যদিও তাতে বাহ্যত আত্মপ্রশংসার ছাপ দেখা যায়। যেমন- নিজের পরিচয় পেশ করতে বলবে, আমি অমুকের পিতা, আমি বিচারপতি অমুক, আমি অধ্যাপক অমুক। তবে এ ক্ষেত্রে উত্তম হলো, পরিচিত নাম বা পদবি অথবা মর্যাদাসহ নিজের নাম উল্লেখ করা।[৫২]

---

৪৮. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : আল-ইস্তি'যান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫১৬৭

৪৯. ইমাম বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, অধ্যায় : আল-ইস্তি'যান, পরিচ্ছেদ : আন-নাযর ফিদ দুওর, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১০৯২; ইমাম বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, পরিচ্ছেদ : কাইফিয়াতুল ওয়াকূফ 'আলা বাবিদ দার..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৮৪৪২

৫০. ইমাম আত-তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ইস্তি'যান, পরিচ্ছেদ : আত-তাসলীম কবলাল ইসতি'যান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৭১১

৫১. ইমাম বুখারী, *আস-সাহীহ*, অধ্যায় : আবওয়াবুল জিযইয়াহ, পরিচ্ছেদ : আমানুন নিসা'..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩০০০

৫২. ইমাম আন-নাবাবী, *আল-মিনহাজ শারহু সাহীহি মুসলিম*, বৈরূত, দারু ইহয়াতিত তুরাছ, ১৩৯২ হি., খ. ১৪, পৃ. ১৩৫

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৩৯
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১৪

আবাসগৃহে প্রবেশাধিকার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

ড. আহমদ আলী*

[সারসংক্ষেপ : অন্ন-বস্ত্রের মতো বাসস্থানও মানবজাতির জন্য একটি মৌলিক প্রয়োজনীয় উপকরণ। তদুপরি এটি মানব সভ্যতার একটি বড় নিদর্শনও বটে। প্রত্যেক মানুষেরই বসবাসের জন্য আবাসস্থলের দরকার হয়। আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবীতে প্রত্যেকের জন্য বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তা মালিকানাধীন হোক কিংবা ভাড়া করা হোক। আবাসস্থলের আসল উদ্দেশ্যই হলো শান্তি ও নিরাপদে অবস্থান। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾ - "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গৃহে তোমাদের জন্য শান্তি ও নিরাপদ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।" (আল-কুরআন, ১৬ : ৮০) এই শান্তি ও নিরাপত্তা তখনই অক্ষুণ্ন থাকতে পারে, যখন মানুষ অন্য কারো হস্তক্ষেপ ব্যতীত নিজ গৃহে প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ ও বিশ্রাম করতে পারে। তার এ স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা গৃহের আসল উদ্দেশ্যকে পণ্ড করে দেয়ার নামান্তর। ইসলাম একটি বাস্তবধর্মী ও সর্বজনীন জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রত্যেকের নিরাপদ আবাসনের সুব্যবস্থা করেছে। মানুষেরা যাতে নিজ নিজ গৃহে স্বাধীন ও নির্বিঘ্নভাবে কাজ ও বিশ্রাম করতে পারে, সে জন্য ইসলাম বিভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে, যা যথাযথভাবে পালন করা হলে আমরা পারিবারিক ও সামাজিকভাবে অনেক জটিলতা থেকে মুক্তি পেতে পারি। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে নিরাপদ ও স্বাধীন আবাস প্রতিষ্ঠায় ইসলামের বিভিন্ন নির্দেশনা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।]

ভূমিকা

নিরাপদ ও স্বাধীন আবাস মানুষের একটি মৌলিক প্রয়োজন। যুগে যুগে ও দেশে দেশে মানুষ এ প্রয়োজন অনুভব করেছে এবং এতদুদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন সময় নানা বিধি-বিধানও প্রণয়ন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ (UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS [UDHR])-এর ১২ নং ধারায় গৃহের নিরাপত্তার স্বীকৃতি দান করা হয়।[১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের -এর

---

* অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

১. Article-12 : No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour

সংবিধানের ৪৩ নং ধারায়ও গৃহের নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।[২] ইসলাম একটি বাস্তবধর্মী ও স্বভাবসম্মত জীবন ব্যবস্থা হিসেবে তার একটি মৌলিক লক্ষ্য হলো মানুষের জন্য নিরাপদ ও স্বাধীন আবাস প্রতিষ্ঠা করা। মানুষেরা যাতে নিজ নিজ গৃহে পূর্ণ নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার সাথে বিচরণ করতে পারে এবং নির্বিঘ্নে বিশ্রাম নিতে পারে সে জন্য আল্লাহ তা'আলা কারো গৃহে প্রবেশ করার সময় ভদ্রজনোচিতভাবে অনুমতি গ্রহণের এবং বিনা অনুমতিতে প্রবেশ না করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ - لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾

হে মু'মিনগণ! তোমাদের নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত অনুমতি গ্রহণ না করো এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না করো। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা সদুপদেশ পেতে পারো। যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করো না। যদি তোমাদের বলা হয়, ফিরে যাও, তবে ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য পবিত্রতম কর্মনীতি। আর তোমরা যা করো আল্লাহ্ তা ভালোভাবেই জানেন। যে সব ঘরে কেউ বাস করে না, উপরন্তু সেখানে তোমাদের কোনো ভোগের সামগ্রীও রয়েছে, এমন ঘরে প্রবেশ করতে তোমাদের কোনো পাপ নেই। তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো আর যা গোপন রাখো, সব বিষয়ই আল্লাহ্ তা'আলা জানেন।[৩]

---

and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks. Tuhin Malik Compiled, *Manual on HUMAN RIGHTS LAW,* Dhaka : Legal Education and Training Institute, Bangladesh Bar Council, Third Edition, 2000, p. 81; Dr. Mizanur Rahman Edited, *HUMAN RIGHTS Summer Sehool Manual*, Dhaka : Human Rights Summer School, 2000, p. 178; www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a12, Date : 23.09.2014

২. বাংলাদেশ সংবিধানের ৪৩ নং ধারা- গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ :
রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের
(ক) প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক হইতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তালাভের অধিকার থাকিবে; এবং
(খ) চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনতা রক্ষার অধিকার থাকিবে।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, আইন, বিচার ও সংসদ বিসয়ক মন্ত্রণালয়, অক্টোবর, ২০১১, পৃ. ১২

৩. আল-কুরআন, ২৪ : ২৭-২৯

আমীরুল মু'মিনীন 'উমার রা. গৃহের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ব্যাহতকারীদের জন্য শাস্তির বিধান প্রণয়ন করেন। বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি এশার পর জনৈক লোকের ঘরে চাটাই জড়ানো অবস্থায় এক ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে তাকে একশ'টি বেত্রাঘাত করেছিলেন।[৪]

নিম্নে গৃহের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইসলামের নির্দেশিত বিধানসমূহ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হলো-

ক. পরগৃহে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করা

অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে হঠাৎ প্রবেশ করলে গৃহবাসীর অধিকার ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। অপর দিকে অনুমতি সাপেক্ষে কারো ঘরে প্রবেশ করলে ঘরের অধিবাসীদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন থাকে। উপরন্তু, তারা আগন্তুকের প্রয়োজন মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারে এবং তা পূরণে সচেষ্ট হতে পারে। পক্ষান্তরে অনুমতি না নিলে মনে ক্ষোভের সঞ্চার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ঘরে মেয়েরা অনেক সময় অসতর্ক অবস্থায় বিচরণ করে। বিনা অনুমতিতে কেউ প্রবেশ করলে উভয় পক্ষকে বিব্রত হতে হয়। তা ছাড়া আগন্তুকের মনে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করলে এ বিব্রতকর অবস্থা হতে মুক্ত থাকা যায়।

ঘরের নির্জনতায় মানুষ কখনো এমন অবস্থায় থাকে, যা সে অন্য কারো কাছে প্রকাশ পাওয়া পছন্দ করে না। এ ছাড়া অনেক সময় ঘরের পরিবেশ এমন অগোছালো থাকে, যা মেহমানের জন্য শোভনীয় নয়। সুযোগ পেলেই ঘরের মালিক সাবধানতা অবলম্বন করে সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশে আনন্দচিত্তে তাকে ঘরে আনতে পারে। অনুমতি না নিলে মুখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেও অন্তরে অসন্তুষ্টি বিরাজ করে।

ক. ১. অনুমতি প্রার্থনা করা ওয়াজিব

ইসলামী আইনে অন্য কারো গৃহে প্রবেশের পূর্বে নারী-পুরুষ, মাহরাম ও গায়র-মাহরাম নির্বিশেষে সকলেরই অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব। অনুমতি ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করার অধিকার কারো নেই। চাই ঘরের দরজা খোলা থাকুক কিংবা বন্ধ থাকুক, চাই ঘরে কেউ থাকুক বা না-ই থাকুক, সর্বাবস্থায় অনুমতি নিয়েই পরগৃহে প্রবেশ করতে হবে। কারণ ঘরের কিছু বাধা-নিষেধ (restriction) রয়েছে, যা

---

৪. আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ*, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩ হি., খ. ৭, পৃ. ৪০১, হাদীস নং-১৩৬৩৮

عن محمد بن راشد قال سمعت مكحولا فحدث أن رجلا وجد في بيت رجل بعد العتمة ملففا في حصير فضربه عمر بن الخطاب مئة

লঙ্ঘন করা জায়িয নয়। তদুপরি অনুমতি প্রার্থনার বিধান কেবল ঘরের অধিবাসীদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই প্রণয়ন করা হয় নি; বরং তাতে ঘরের অধিবাসীদের প্রতি যেমন লক্ষ্য রাখা হয়েছে, তেমনি তাদের ধন-সম্পদের গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। লোকেরা যেমন ঘরকে আত্মরক্ষার উপকরণ হিসেবে গড়ে তোলে, তেমনি তাকে সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্র হিসেবেও তৈরি করে। তারা যেমন নিজের গোপনীয় ব্যাপারাদি অপরকে অবহিত করতে অপছন্দ করে, তেমনি তারা নিজের ধন-সম্পদও অপরের কাছে প্রকাশ করতে চায় না।[৫] বিশিষ্ট তাবি'ঈ 'আতা [২৭-১২৪ হি.] রহ. বলেন, "পরগৃহে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করা প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের ওপর ওয়াজিব।"[৬] মালিকী মতাবলম্বী ইমামগণ বলেন, "কেউ যদি অন্যের বাড়িতে প্রবেশের জন্য অনুমতি চাওয়ার বিধানকে অস্বীকার করে, সে কাফির হয়ে যাবে। কারণ সে প্রকারান্তরে দীনের একটি সুস্পষ্ট বিধানকেই অস্বীকার করলো।"[৭]

উপর্যুক্ত আয়াতে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا বলে মু'মিন পুরুষদেরকে সম্বোধন করা হলেও নারীরাও এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। সাহাবীগণের স্ত্রীরাও এ আয়াতের নির্দেশের আলোকে অনুমতি গ্রহণের বিধান মেনে চলতেন। উম্মু ইয়াস রা. বলেন, "আমরা চারজন মহিলা প্রায়ই উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা রা.-এর ঘরে যেতাম। প্রথমে আমরা তাঁর নিকট অনুমতি চাইতাম। তিনি অনুমতি দিলে আমরা ভেতরে প্রবেশ করতাম।"[৮]

পরগৃহের মতো নিজের ভাড়া দেয়া গৃহেও প্রবেশ করতে হলে ভাড়ায় অবস্থানকারী গৃহবাসীদের নিকট অনুমতি চাইতে হবে। বিনা অনুমতিতে সেখানে প্রবেশ করা জায়িয নেই।[৯] ইমাম আবূ ইউসূফ [১১৩-১৮২ হি.] ও ইমাম মুহাম্মাদ [১৩১-১৮৯ হি.] রহ. প্রমুখের মতে, যদি ভাড়াটিয়া অনুমতি নাও দেয়, তবুও ঘরের অবস্থা দেখা

---

৫. 'আলাউদ্দীন কাসানী, *বাদা'য়িউছ ছানা'ই*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'আরবী, ১৯৮২, খ. ৫, পৃ. ১২৪

৬. আবুল ফাদ্‌ল শিহাবুদ্দীন আল-আলূসী, *রূহুল মা'আনী*, বৈরূত : দারু ইহয়াতিত তুরাছিল আরবী, ১৯৮৫, খ. ১৮, পৃ. ১৩৫

৭. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ূনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯০, খ. ৩, পৃ. ১৪৭ (সূত্র: *তাফসীরুল কুরতুবী*, খ. ১২, পৃ. ২১৯; *আহকামুল কুরআন*, খ. ৩, পৃ. ৩৮৬; *আশ-শারহুস সাগীর*, খ. ৪, পৃ. ৭৬২; *শারহুল কাফী*, খ. ২, পৃ. ১১৩২; *আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী*, খ. ২, পৃ. ১৪৬)

৮. ইবনু আবী হাতিম, *আত-তাফসীর*, ছায়দা : আল-মাকতাবাতুল 'আসারিয়্যাহ, হাদীস নং-১৪৩৬২; আবুল ফাদ্‌ল শিহাবুদ্দীন আল-আলূসী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৮, পৃ. ১৩৫

كنت في أربع نسوة نستأذن على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت : ندخل فقالت : لا فقال واحد : السلام عليكم أندخل قالت : ادخلوا ثم قالت يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم الخ

৯. ড. আবদুল কারীম যায়দান, *আল-মুফাছ্‌ছাল ফী আহকামিল মার'আতি*, বৈরূত : মু'আসসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৭, খ. ৩, পৃ. ৪৮৮

ও মেরামত করার উদ্দেশ্যে ঘরের মালিকের ভেতরে প্রবেশ করার অধিকার থাকবে। তবে ইমাম আবূ হানীফাহ [৮০-১৫০ হি.] রহ.-এর মতে, ভাড়াটিয়ার সম্মতি লাভ করা ছাড়া মালিকের ঘরে প্রবেশের অধিকার থাকবে না।"[১০]
উল্লেখ্য যে, নিম্ন আওয়াজে অনুমতি প্রার্থনা করা মুস্তাহাব। তবে তা এতোটুকু পরিমাণ স্পষ্ট হওয়া দরকার, যাতে গৃহবাসী শুনতে পায়। তবে কর্কশ আওয়াজে বা চিৎকার করে অনুমতি চাওয়া উচিত নয়।[১১]

ক. ২. অনুমতি লাভ করার জন্য ঘরের লোকদেরকে সালাম ও প্রীতি বিনিময় করা

অনুমতি গ্রহণের জন্য দুটি কাজ না করে কারো ঘরে প্রবেশ করা ঠিক নয়। প্রথমত, প্রীতি বিনিময় করা বা অনুমতি প্রার্থনা করা। মূলত ঘরে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি চাওয়া দ্বারা ঘরের মালিকের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয় এবং আগন্তুকের প্রতি আতঙ্ক দূরীভূত হয়। দ্বিতীয়ত, ঘরের লোকদেরকে সালাম করা। ইমাম আবূ যাকারিয়া আন-নাবাবী [৬৩১-৬৭৬ হি.] রহ. বলেন, সুন্নাত হলো সালাম করা ও তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করা।[১২] ইমাম ইবনু রুশদ আল-কুরতুবী আল-মালিকী [৫২০-৫৯৫ হি.] রহ. বলেন, প্রথমে অনুমতি প্রার্থনা করবে। তারপর সালাম করবে।[১৩] বিশিষ্ট মুফাসসির আবূ 'আবদুল্লাহ আল-কুরতুবী [মৃ.৬৭১ হি.] রহ.-এর মতে, প্রথমে অনুমতি নিয়ে পরে ঘরে প্রবেশের সময় সালাম করবে।[১৪] ইমাম আবুল হাসান আল-মাওয়ার্দী [৩৬৪-৪৫০হি.] রহ. বলেন, যদি অনুমতি নেয়ার পূর্বে ঘরের কোনো ব্যক্তির সাথে দেখা হয়, তবেই প্রথমে সালাম করবে। এরপর অনুমতি চাইবে। দেখা না হলে প্রথমে অনুমতি চাইবে। অনুমতি পাওয়া গেলে ঘরে প্রবেশের সময় সালাম করবে।[১৫]

কিন্তু বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, বাহির থেকে প্রথমে সালাম করতে হবে। তারপর নিজের নাম উচ্চারণ করে বলবে যে, অমুক সাক্ষাত করতে চায়। সাইয়িদুনা রিব'ঈ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ স. একটি ঘরে অবস্থান

---

১০. ইবনু 'আবিদীন, *হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার*, বৈরূত : দারুল ফিকর, ২০০০, খ. ৬, পৃ. ১৯৯

১১. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত*, প্রবন্ধ : ইস্তি'যান, খ. ৩, পৃ. ১৫১

১২. ইয়াহয়া ইবনু শারফ আন-নাবাবী, *শারহু সাহীহি মুসলিম*, দিল্লী : কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ, তা.বি., খ. ২, পৃ. ২১০

১৩. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, ইস্তি'যান, খ. ৩, পৃ. ১৪৬ (সূত্র : *আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী*, খ. ২, পৃ. ৪৬৭; *আশ-শারহুস সাগীর*, খ. ৪, পৃ. ১৪৬)

১৪. ইমাম আল-কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন*, রিয়াদ : দারু 'আলামিল কুতুব, ২০০৩, খ. ১২, পৃ. ২১৯

১৫. হাফেজ মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, পরগৃহে প্রবেশের ইসলামী পদ্ধতি, *অগ্রপথিক*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বর্ষ : ১৪, সংখ্যা : ২, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯, পৃ. ১২০

করছিলেন। এমতাবস্থায় বানূ 'আমির গোত্রের জনৈক ব্যক্তি এসে ঘরের বাইরে থেকে বললো, আমি কী ঢুকতে পারবো? তখন রাসূলুল্লাহ স. তাঁর খাদিম আনাস রা.কে বললেন, লোকটি অনুমতি চাওয়ার নিয়ম জানে না। বাইরে গিয়ে তাকে নিয়ম শিখিয়ে দাও। সে প্রথমে বলবে, আসসালামু 'আলাইকুম। তারপর বলবে, আমি কী প্রবেশ করতে পারি? লোকটি বাইরে থেকে রাসূলুল্লাহ স.-এর কথা শুনে বললো, "আসসালামু 'আলাইকুম। আমি কী প্রবেশ করতে পারি?" তখন রাসূলুল্লাহ স. তাকে অনুমতি দান করলেন। এরপর লোকটি ভেতরে প্রবেশ করলো।[১৬]

সাইয়িদুনা কালাদাহ ইবনু হাম্বাল রা. থেকেও বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার সাফওয়ান ইবনু উমাইয়াহ রা. ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁকে সামান্য দুধ ও কয়েকটি শসা নিয়ে রাসূলুল্লাহ স.-এর খিদমাতে পাঠালেন। আমি তাঁর কাছে অনুমতি না চেয়ে এবং সালাম না করে ঢুকে পড়লাম। তখন রাসূলুল্লাহ স. বললেন, "তুমি ফিরে গিয়ে বলো, আসসালামু 'আলাইকুম। আমি কী প্রবেশ করতে পারি?"[১৭]

উপর্যুক্ত হাদীসসমূহের আলোকে ইসলামী আইনবিদগণ বলেন, প্রথম সালাম হচ্ছে অনুমতির বাক্য শ্রবণের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য। অনুমতি লাভের পর ঘরে প্রবেশের সময় যথারীতি পুনরায় সালাম করতে হবে।[১৮]

ক. ৩. অন্ধলোকেরও অনুমতি নিতে হবে

পরগৃহে প্রবেশ করার জন্য অন্ধলোককেও অনুমতি নিতে হবে। কারণ সে চোখে না দেখলেও কানে গোপন কথা শুনতে পারে।[১৯]

---

১৬. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : কাইফাল ইস্তি'যান, বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, হাদীস নং-৫১৭৯

عَنْ رِبْعِىٌّ قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِى عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ فِى بَيْتٍ فَقَالَ أَلِجُ فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- لِخَادِمِهِ « اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الاِسْتِئْذَانَ فَقُلْ لَهُ قُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ ». فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَدَخَلَ.

১৭. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : কাইফাল ইস্তি'যান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫১৭৮; ইমাম আত-তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ইস্তি'যান, পরিচ্ছেদ : আত-তাসলীম কাবলাল ইস্তি'যান, বৈরূত : ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, হাদীস নং-২৭১০

عَنْ كَلَدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِلَبَنٍ وَجِدَايَةٍ وَضَغَابِيسَ - وَالنَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- بِأَعْلَى مَكَّةَ - فَدَخَلْتُ وَلَمْ أُسَلِّمْ فَقَالَ « ارْجِعْ فَقُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ».

১৮. হাফেজ মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১

১৯. আবুল ফাদল শিহাবুদ্দীন আল-আলূসী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৮, পৃ. ১৩৫-৬; ড. আবদুল কারীম যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৪৯৩-৪

ক. ৪. অনুমতি ছাড়া পরগৃহে প্রবেশের বিশেষ অবস্থাসমূহ

যদি অনুমতি না নিয়ে পরগৃহে প্রবেশ করলে কারো প্রাণ কিংবা সম্পদ অথবা মান-সম্মান রক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, অপরদিকে অনুমতি চেয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা হলে কারো মৃত্যুবরণ করার বা নিহত হওয়ার অথবা সম্পদ খোয়া যাওয়ার বা নষ্ট হওয়ার বা মান-সম্মান হারানোর আশঙ্কা সৃষ্টি হয়, তা হলে অনুমতি ছাড়াই অন্যের ঘরে প্রবেশ করা জায়িয রয়েছে। ইসলামী আইনবিদগণ এ ধরনের কিছু ব্যাপার উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন,

১. যদি শত্রুরা কাউকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে কারো ঘরে চড়াও হয়ে যায়, এমতাবস্থায় গৃহবাসীকে রক্ষার জন্য অনুমতি ছাড়া তার ঘরে প্রবেশ করা জায়িয।
২. যদি কারো ঘরে চোর-ডাকাত ঢুকে পড়ে, তা হলে সেখানেও গৃহবাসী ও তার ধন-সম্পদকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা জায়িয।
৩. যদি কেউ কারো ঘরে কোনো কাপড় বা মূল্যবান বস্তু ভুলে রেখে চলে আসে, আর সে আশঙ্কা করছে যে, যদি ঘরের লোকেরা তা জানতে পারে, তা হলে তারা তা কুক্ষিগত করে ফেলবে। এমতাবস্থায় ফেলে যাওয়া বস্তুটি নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে অনুমতি ছাড়া ঘরে প্রবেশ করা জায়িয হবে।
৪. যদি কোনো অপরহরণকারী কারো কোনো বস্তু ছিনতাই করে তার নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে, এমতাবস্থায় বস্তুর মালিক তার ছিনিয়ে নেয়া বস্তুটি উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে অপরহরণকারীর ঘরে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করতে পারবে।
৫. যদি কারো ঘরে আগুন লাগে, তা হলে তাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সেখানে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা জায়িয হবে।
৬. যদি কেউ মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তা হলে তাকে দেখার জন্য বা সাহায্য করার জন্য অনুমতি ছাড়া তার ঘরে প্রবেশ করা জায়িয।
৭. ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. প্রমুখের মতে, যদি কেউ তার ঘর কাউকে ভাড়া দেয়, তা হলে ঘরের অবস্থা দেখা ও মেরামত করার উদ্দেশ্যে তার ভেতরে প্রবেশ করার অধিকার থাকবে, যদিও ভাড়াটিয়া অনুমতি না দেয়। তবে ইমাম আবূ হানীফাহ রহ.-এর মতে, ভাড়াটিয়ার সম্মতি লাভ করা ছাড়া মালিকের ঘরে প্রবেশের অধিকার থাকবে না।
৮. যুদ্ধাবস্থায় শত্রুরা কোনো ঘরে ঢুকে পড়লে সেখানে তাদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যোদ্ধাদের জন্য ঘরের মালিকের অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা জায়িয।[২০]

---

২০. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৪৮-৯, খ. ২৫, পৃ. ১২৮-৯ (সূত্র: *হাশিয়াতু ইবনি 'আবিদীন*, খ. ৫, পৃ. ১২৬; *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ. ৮, পৃ. ২৪)

৯. হানাফী ও মালিকী মতাবলম্বী ইমামগণের মতে, যদি কারো ঘরে কোনো জঘন্য অপকর্ম বা পাপাচার হতে দেখা যায় বা জানা যায় অথবা প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয়, তা হলে তা প্রতিরোধ করার মহৎ উদ্দেশ্যে সেখানে ঘরের মালিকের অনুমতি ছাড়া মুসলিম শাসক বা তাঁর প্রতিনিধির প্রবেশ করা জায়িয। যেমন- কারো ঘরে অবৈধ বাদ্যযন্ত্র বাজানো হচ্ছে, যদি তার আওয়াজ বাইরে শোনা যায় বা তা জানা যায়, তা হলে তা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সেখানে মুসলিম শাসক বা তাঁর প্রতিনিধির জন্য অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা জায়িয হবে। এর কারণ হলো,

প্রথমত ঘরে যখন অন্যায় ও পাপাচারের চর্চা হয়, তখন তার আর বাধা-নিষেধ (restriction) থাকে না। আর যখন তার বাধা-নিষেধ (restriction) বাতিল হয়ে যায়, তখন সেখানে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা জায়িয হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত, অন্যায়ের প্রতিরোধ করা ফারয। তাই এ ক্ষেত্রে যদি অনুমতি গ্রহণের শর্তারোপ করা হয়, তা হলে অন্যায়ের প্রতিরোধ করা দুষ্কর হয়ে পড়বে।

বর্ণিত রয়েছে, একবার 'উমার রা. কাতরতার সাথে বিলাপরত জনৈকা মহিলার ঘরে আকস্মিকভাবে প্রবেশ করে তাকে এমনভাবে বেত্রাঘাত করেছিলেন, যাতে তার ওড়না মাথা থেকে পড়ে গিয়েছিল। এরপর 'উমার রা. কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন যে,

لا حُرْمَةَ لَهَا بَعْدَ اشْتِغَالِهَا بِالْمُحَرَّمِ وَالْتَحَقَتْ بِالإِمَاءِ.

'হারাম কাজে লিপ্ত থাকার কারণে মহিলাটির আব্রু রক্ষার কোনো দায় নেই। তার অবস্থা দাসীদের অনুরূপ হয়ে গেছে।'[২১]

শাফি'ঈ মতাবলম্বী ইমামগণের মতে, যদি কেউ জানতে পারে যে, কোনো ঘরে মদ্য পানের আসর চলছে বা তানপুরা বাজানো হচ্ছে, তা হলে বিপর্যয় সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকলে সেখানে আকস্মিকভাবে প্রবেশ করে অপকর্ম প্রতিরোধ করার অধিকার রয়েছে। প্রয়োজনে বল প্রয়োগ করে বন্ধ করাও জায়িয।[২২] তাঁরা হানাফী ইমামগণের তুলনায় বিষয়টি একটু বেশি বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের মতে, অন্যায় যদি এ ধরনের হয়, যা তাৎক্ষণিকভাবে

---

২১. ইমাম আল-কুরতুবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৮, পৃ. ৭৫; ইবনু 'আবিদীন, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৬৫
পূর্ণ রিওয়ায়াতটি হলো-

روي أن عمر رضي الله تعالى بلغه نائحة في ناحية من المدينة فأتاها حتى هجم عليها في منزلها فضربها بالدرة حتى سقط خمارها فقيل له يا أمير المؤمنين أخمارها قد سقط فقال : إنه لا حُرْمَةَ لَهَا بَعْدَ اشْتِغَالِهَا بِالْمُحَرَّمِ وَالْتَحَقَتْ بِالإِمَاءِ .

২২. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, *প্রাগুক্ত*, খ. ২৫, পৃ. ১২৮-৯ (সূত্রঃ *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ. ৮, পৃ. ২৪)

দমন করতে হয়, পরে দমন করার সুযোগ না থাকে, তা হলে অনুমতি ছাড়াই ঘরে প্রবেশ করা বৈধ হবে। যেমন কেউ কোনো বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে জানতে পারলো যে, কোনো ঘরে এক লোক অন্য একজন লোককে হত্যা করার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছে অথবা কেউ কোনো মহিলার সাথে যিনা করার জন্য নির্জনে মিলিত হয়েছে, তবে লোকটিকে হত্যার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এবং মেয়েটির সম্ভ্রম রক্ষার জন্য গোপনে তাদের অবস্থা দেখা ও ঘরের ভেতরে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা বৈধ হবে। কারণ এমতাবস্থায় অনুমতির জন্য অপেক্ষা করা হলে অপরাধগুলো সংঘটিত হয়ে যাবে, পরে এগুলো প্রতিহত করার কোনো সুযোগ থাকবে না। আর যদি অন্যায় এ ধরনের হয়, যা তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিরোধ না করলেও পরে প্রতিরোধ করার বা বারণ করার সুযোগ থাকে অথবা যা ঘরে প্রবেশ না করেই প্রতিহত করা যায়, তা হলে অনুমতি ছাড়া ঘরে প্রবেশ করা বৈধ হবে না।[২৩]

ক. ৫. তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করা

কারো যদি ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করার পর মনে হয় যে, গৃহবাসী তার অনুমতি প্রার্থনা শোনতে পায় নি, তা হলে সে ততবারই অনুমতি প্রার্থনা করতে পারবে, যতক্ষণ তার এ ধারণা সৃষ্টি হবে না যে, গৃহবাসী তার অনুমতি প্রার্থনা শুনতে পেয়েছে। তবে অধিকাংশ 'আলিমের মতে, তিনবারের অধিক অনুমতি প্রার্থনা করা সমীচীন নয়।[২৪]

আবূ মূসা আল-আশ'আরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ

তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও যদি অনুমতি পাওয়া না যায়, তাকে ফিরে আসা উচিত।[২৫]

ইমাম মালিক [৯৩-১৭৯ হি.] রহ.-এর মতে, তিনবারের চাইতেও বেশি অনুমতি প্রার্থনা করতে পারবে, যদি সে নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যে, গৃহবাসী তার অনুমতি

---

২৩. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৪৮-৯ (সূত্রঃ *হাশিয়াতুল কালয়ূবী*, খ. ৩, পৃ. ৩৩; *মা'আলিমুল কুরবাতি ফী আহকামিল হিসবাহ*, পৃ. ৩৭-৮)

২৪. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৫০ (সূত্র : *'উমদাতুল কারী*, খ. ২২, পৃ. ২৪১; *তাফসীরে আল-কুরতুবী*, খ. ১২, পৃ. ২১৪; *আশ-শারহুস সাগীর*, খ. ৪, পৃ. ৭৬২; *শারহুল কাফী*, খ. ২, পৃ. ১১৩৪; *হাশিয়াতু ইবনি 'আবিদীন*, খ. ৫, পৃ. ২৬৫)

২৫. ইমাম বুখারী, *আস-সাহীহ*, অধ্যায় : আল-ইস্তি'যান, পরিচ্ছেদ : আত-তাসলীম ওয়াল-ইস্তি'যান ..., বৈরূত : দারু ইবনি কাছীর, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., হাদীস নং-৫৮৯১; ইমাম মুসলিম, *আস-সাহীহ*, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : আল-ইস্তি'যান, বৈরূত : দারুল জীল ও দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, হাদীস নং-৫৭৫১

প্রার্থনা শুনতে পায় নি।[২৬] ইমাম আবূ যাকারিয়া আন-নাবাবী [৬৩১-৬৭৬ হি.] রহ. এ বিষয়ে অন্য একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন। তা হলো, যদি সালামের সাহায্যে অনুমতি প্রার্থনা করা হয়, তা হলে তিনবারের অধিক পুনরাবৃত্তি করবে না। আর যদি অন্য শব্দের সাহায্যে অনুমতি প্রার্থনা করা হয়, তা হলে তিনবারের অধিক পুনরাবৃত্তি করতে পারবে।[২৭]

উল্লেখ্য যে, একাধারে লাগাতার তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করবে না; বরং একবার অনুমতি চাওয়ার পর একজন আহাররত ব্যক্তি আহার শেষ করতে বা অযুরত ব্যক্তি অযু শেষ করতে বা নামায আদায়রত ব্যক্তি চার রাকআত নামায শেষ করতে যতক্ষণ সময় লাগে, ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করে আরেকবার অনুমতি চাইবে, যাতে গৃহবাসী এ ধরনের কোনো কাজে ব্যাপৃত থাকলে তা সম্পন্ন করার সুযোগ পায় আর যদি এ ধরনের কোনো কাজে ব্যাপৃত নাও থাকে, তা হলে সে যেন সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার অবকাশ লাভ করে।[২৮] রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

الاستئذان ثلاث ، فالأولى يستنصتون، والثانية يستصلحون، والثالثة: يأذنون أو يردون.

অনুমতি প্রার্থনা হলো তিনবার। প্রথমবার গৃহবাসী শুনবে। দ্বিতীয়বার তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। তৃতীয়বার হয়তো তারা অনুমতি দেবে অথবা ফিরিয়ে দেবে।[২৯]

ক. ৬. ফিরে যেতে বলা হলে অথবা ঘরে কাউকে পাওয়া না গেলে ফিরে যাওয়া উচিত

কারো ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাওয়ার পর যদি বলা হয়, এখন ফিরে যান, পরে দেখা করুন, তবে এতে মনে কষ্ট না নিয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে যাওয়া উচিত। একে খারাপ মনে করা, দরজায় বসে থাকা, অনুমতি অর্জনের জন্য পীড়াপীড়ি করা ও অকথ্য ভাষা ব্যবহার করা প্রভৃতি উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে যে,

﴿وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ﴾

যদি তোমাদেরকে বলা হয় যে, ফিরে যাও, তবে ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য পবিত্রতম কর্মনীতি।[৩০]

---

২৬. ড. আবদুল কারীম যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩. পৃ. ৪৯৭-৮

২৭. ইয়াহইয়া ইবনু শারফ আন-নাবাবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২১০

২৮. ইবনু 'আবিদীন, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৪১৩

২৯. মুহাম্মাদ 'আবদুর রা'উফ আল-মুনাবী, *ফায়যুল কাদীর*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪, খ. ৩, পৃ. ২২৯; আবুল ফাদল আল-'ইরাকী, *আল-মুগনী 'আন হামলিল আসফার*, রিয়াদ : মাকতাবাহ তাবারিয়্যাহ, ১৯৯৫, খ. ১, পৃ. ৪৯১। হাদীসটির সানাদ দুর্বল।

৩০. আল-কুরআন, ২৪ : ২৮

আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আবূ মূসা আল-আশ'আরী রা. আমীরুল মু'মিনীন 'উমার রা.-এর কাছে অনুমতি লাভ করার জন্য বললেন, "আসসালামু 'আলাইকুম, আমি কী প্রবেশ করতে পারি?" 'উমার রা. মনে মনে বললেন, এটা প্রথম দফা। এরপর আবূ মূসা আল-আশ'আরী রা. কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বললেন, "আসসালামু 'আলাইকুম, আমি কী প্রবেশ করতে পারি?" এবার 'উমার রা. মনে মনে বললেন, এটা দ্বিতীয় দফা। এরপর আবূ মূসা আল-আশ'আরী রা. কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বললেন, "আসসালামু 'আলাইকুম। আমি কী প্রবেশ করতে পারি?" এবার 'উমার রা. মনে মনে বললেন, এটা তৃতীয় দফা। এরপর আবূ মূসা আল-আশ'আরী রা. ফিরে গেলেন। তখন 'উমার রা. দারওয়ানকে বললেন, দেখো তো লোকটি কী করলো? সে বললো, তিনি চলে গেছেন। 'উমার রা. বললেন, তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আবূ মূসা আসলে, 'উমার রা. তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, তুমি এ কী করলে? তিনি জবাব দিলেন, এটাই সুন্নাত (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসৃত রীতি)।[৩১]

অনুমতিপ্রার্থীর প্রতি এ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে ঘরের মালিকের প্রতি দৃষ্টি রেখে। কারণ, তার বিশেষ কোনো অসুবিধা থাকতে পারে। পক্ষান্তরে হাদীসে ঘরের মালিককে বলা হয়েছে যে, সাক্ষাতপ্রার্থী ব্যক্তিরও তোমার ওপর হক রয়েছে। তার হক হচ্ছে তাকে কাছে ডাকা, বাইরে এসে তার সাথে দেখা করা, তার কথা শোনা, তাকে ঘরে বসতে দেয়া, তার সম্মান করা, মেহমানদারি করা, একান্তই অসুবিধা না থাকলে তাকে ফিরিয়ে না দেয়া। যদি অনুমতি চাওয়ার পর দেখা যায় যে, ঘরে কেউ নেই অথবা অনুমতি দেয়ার মতো উপযুক্ত কেউ নেই, তা হলেও ঘরে প্রবেশ করা জায়িয হবে না; বরং ফিরে যাওয়া উচিত।

ক. ৭. উন্মুক্ত ঘরে প্রবেশ করার জন্য অনুমতির প্রয়োজন নেই

যে ঘরে কেউ বাস করে না, সেখানে প্রবেশের জন্য অনুমতির প্রয়োজন নেই। কারো ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতির বিধান নাযিল হওয়ার পর সাইয়িদুনা আবূ বাক্র আছ-ছিদ্দীক রা. রাসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করলেন, এতে কুরাইশ ব্যবসায়ীগণের

---

৩১. ইমাম আত-তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ইস্তি'যান, পরিচ্ছেদ : আল-ইস্তি'যান ছালাছাতুন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৬৯০

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ قَالَ عُمَرُ وَاحِدَةٌ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ قَالَ عُمَرُ ثِنْتَانِ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ فَقَالَ عُمَرُ ثَلَاثٌ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ لِلْبَوَّابِ مَا صَنَعَ قَالَ رَجَعَ قَالَ عَلَيَّ بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتَ قَالَ السُّنَّةُ

অসুবিধা হবে। কারণ, তারা সিরিয়া যাওয়ার সময় পথে সরাইখানাতে অবস্থান করে। এ সব ঘরে কোনো স্থায়ী বাসিন্দা নেই, এখানে কিভাবে অনুমতি নেবে? এ সময় নাযিল হয়- ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ﴾

> যে সব ঘরে কেউ বাস করে না, উপরন্তু সেখানে তোমাদের কোনো ভোগের সামগ্রী রয়েছে, এমন ঘরে প্রবেশ করতে তোমাদের কোনো পাপ নেই।[৩২]

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, মুসাফিরখানা, বিশ্রামাগার, মসজিদ, খানকা, জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, চিত্তবিনোদন কেন্দ্র, গণসৌচাগার, ধর্মীয় পাঠাগার, চিকিৎসাকেন্দ্র, দোকান-পাট এসব স্থানে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা যাবে।[৩৩] তবে যে সব স্থানে কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং টিকেট বা প্রবেশপত্র ছাড়া ঢোকার অনুমতি নেই, সেখানে অবশ্যই নিয়ম মোতাবেক প্রবেশ করতে হবে।

ক. ৮. ডাকার জন্য পাঠানো লোকের সাথে আসলে অনুমতির প্রয়োজন নেই

কাউকে লোক পাঠিয়ে ডাকা হলে সে ঐ লোকের সাথে চলে আসলে অনুমতির প্রয়োজন নেই। আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, যদি কোনো ব্যক্তিকে ডেকে পাঠানো হয় এবং সে ঐ লোকটির সাথে চলে আসে, তা হলে কি তারও অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে? তিনি বললেন, هو إذنه "তাকে ডেকে পাঠানোই হলো তাকে অনুমতি দান।"[৩৪] তবে পরে আসলে অনুমতি নিতে হবে অথবা সতর্কতামূলকভাবে অনুমতি নিলে ভালো। এ প্রসঙ্গে আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি একটি পেয়ালায় সামান্য দুধ দেখতে পেয়ে আমাকে বললেন, আবূ হুরাইরা! তুমি গিয়ে সুফফাবাসীদেরকে আমার দাওয়াত জানিয়ে এসো। আমি তাঁদের নিকট গিয়ে দা'ওয়াত পৌঁছালাম। পরে তাঁরা এসে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রাসূলুল্লাহ স. তাঁদেরকে অনুমতি দান করার পর তাঁরা ভেতরে ঢুকলেন।"[৩৫]

---

৩২. আল-কুরআন, ২৪ : ২৯

৩৩. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৪৭-৮ (সূত্র: *তাফসীরে কুরতুবী,* খ. ১২, পৃ. ২১১-২; *আহকামুল কুরআন,* খ. ৩, পৃ. ৩৮৭; *আশ-শারহুস সাগীর,* খ. ৪, পৃ. ৭৬১; *শারহুল কাফী,* খ. ২, পৃ. ১১৩৪; *আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী,* খ. ২, পৃ. ৪২৬; *'উমদাতুল কারী,* খ. ১২, পৃ. ১৩১; *বাদা'য়িউছ ছানা'ই,* খ. ৫, পৃ. ১২৫)

৩৪. ইমাম বুখারী, *আস-সাহীহ,* অধ্যায় : আল-ইস্তি'যান, পরিচ্ছেদ : ইযা দু'ইয়ার রাজুলু..., ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : আর-রাজুলু ইযা ইয়ুদ'আ..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫১৯১, ৫১৯২

৩৫. ইমাম বুখারী, *আস-সাহীহ,* অধ্যায় : আল-ইস্তি'যান, পরিচ্ছেদ : ইযা দু'ইয়ার রাজুলু..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৮৯২

ইমাম বাইহাকী রহ. বলেন, এ বিধান এমন ঘরের জন্য প্রযোজ্য হবে, যাতে কোনো ধরনের বাধা (restriction) নেই। আর যে সব ঘরে কোনো ধরনের বাধা আছে, সেখানে প্রবেশ করতে হলে অনুমতি নেয়া প্রয়োজন।[৩৬]

উপর্যুক্ত হাদীস থেকে জানা যায়, টেলিফোনের সংবাদের ভিত্তিতে আসলে তাকেও অনুমতি নিতে হবে।

ক. ৯. দরজা নক করে বা কড়া নেড়ে অনুমতি চাওয়া বৈধ

দরজা নক করে বা কড়া নেড়ে অনুমতি প্রার্থনা করা জায়িয। চাই দরজা বন্ধ হোক বা খোলা হোক। তবে কড়া এতো জোরে নাড়া উচিত নয়, যাতে ঘরের লোক চমকে ওঠে অথবা বিরক্তি বা কষ্ট অনুভব করে। এভাবে দরজা নকও অতি মৃদুভাবে হওয়া উচিত।[৩৭] আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَت أبواب رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم تُقرَعُ بِالأَظَافِيرِ.

রাসূলুল্লাহ স.-এর দরজাগুলো নখের সাহায্যে নক করা হতো।[৩৮]

নাফি' ইবনু 'আবদিল হারিছ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার বের হয়ে রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে একটি বাগানে গিয়ে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, দরজাটি টেনে ধরো। আর তিনি দরজা নক করলেন।[৩৯] জাবির ইবনু

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ فَقَالَ أَبَا هِرٍّ الْحَقْ أَهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَيَّ قَالَ فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَأُذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا

৩৬. ইমাম আল-বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, মাক্কাহ : মাকতাবাতু দারিল বায, ১৯৯৪, খ. ৮, পৃ. ৩৪০; মুহাম্মাদ শামসুল হক 'আযীমাবাদী, *'আওনুল মা'বূদ*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৫ হি., খ. ১৪, পৃ. ৬৩

৩৭. ড. আবদুল কারীম যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৪৯৯-৫০০

৩৮. ইমাম বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, অধ্যায় : আল-ইস্তিযান, পরিচ্ছেদ : কার'উল বাব, বৈরূত : দারুল বাশায়ির আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খ্রি., হাদীস নং-১০৮০; ইমাম বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, পরিচ্ছেদ ১৫ : তা'যীমুন্নাবী সা..., বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি., হাদীস নং-১৪৩৭; বিশিষ্ট হাদীস গবেষক শায়খ আলবানী রহ. বলেন, হাদীসটি সাহীহ।

৩৯. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : আর-রাজুলু ইয়াস্তা'যিনু বিদ-দাক্কি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫১৯০

عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى دَخَلْتُ حَائِطًا فَقَالَ لِى « أَمْسِكِ الْبَابَ ». فَضُرِبَ الْبَابُ فَقُلْتُ « مَنْ هَذَا ». وَسَاقَ الْحَدِيثَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِى حَدِيثَ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَالَ فِيهِ فَدَقَّ الْبَابَ.

'আবদিল্লাহ রা. থেকেও বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার মৃত পিতার ঋণ সম্পর্কে আলাপ করার জন্য রাসূলুল্লাহ স.-এর দরবারে গিয়েছিলাম। আমি গিয়ে দরজার কড়া নাড়তেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি জবাব দিলাম, আমি। তিনি বললেন, আমি! আমি!। আমার মনে হলো যে, তিনি আমার এ উত্তর পছন্দ করেন নি।[৪০]

ক. ১০. কলিং বেল বা পরিচয় পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অনুমতি চাওয়া বৈধ

কলিং বেল বাজিয়ে অনুমতি চাওয়াও বৈধ। তবে কলিং বেল জোরো ও দীর্ঘ সময় ধরে বাজানো উচিত নয়; বরং মৃদুভাবেই বাজাবে[৪১] এবং অনুমতি প্রার্থনা করার মতোই কলিং বেল একবার বাজানোর পর একজন আহাররত ব্যক্তি আহার শেষ করতে বা অযুরত ব্যক্তি অযু শেষ করতে বা নামায আদায়রত ব্যক্তি চার রাক'আত নামায শেষ করতে যতক্ষণ সময় লাগে, ততক্ষণ সময় অপেক্ষা করে আরেকবার কলিং বেল বাজাবে। কলিং বেল বাজাবার সময় ভেতর থেকে পরিচয় জানতে চাইলে নামসহ পরিচয় দিতে হবে। পরিচয়পত্র প্রেরণের মাধ্যমেও অনুমতি চাওয়া বৈধ। পরিচয়পত্রে তো নাম উল্লেখ থাকবেই। এটা ভিন দেশীয় প্রথা হলেও এভাবে অনুমতি চাওয়ার লক্ষ্য সুন্দররূপে অর্জিত হয়।

ক. ১১. গলার শব্দ করে অনুমতি গ্রহণ করাও বৈধ

গলার শব্দ করে অনুমতি গ্রহণ করাও বৈধ। আবূ আইয়ূব আল-আনসারী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ স. কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা তো সালাম। আর অনুমতি গ্রহণ কী?[৪২] তিনি বললেন,

يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ : تَسْبِيحَةً ، وَتَكْبِيرَةً ، وَتَحْمِيدَةً ، وَيَتَنَحْنَحُ ، وَيُؤْذِنُ أَهْلَ الْبَيْتِ

> অনুমতি প্রার্থী ব্যক্তিটি একবার 'সুবহানাল্লাহ' বা 'আল্লাহু আকবার' বা 'আল-হামদু লিল্লাহ' পড়বে এবং গলার শব্দ করবে এবং এভাবেই সে ঘরওয়ালাকে তার উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করবে।[৪৩]

---

৪০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ইস্তি'যান, পরিচ্ছেদ : ইযা কালা মান যা.., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৮৯৬; ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : আর-রাজুলু ইয়াস্তা'যিনু বিদ-দাক্কি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫১৮৯

عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهَا

৪১. ড. আবদুল কারীম যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫০০

৪২. আল্লাহ তা'আলার বাণী ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ - এর মধ্যে সালাম ব্যতীত যে অনুমতি গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

৪৩. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : আল-ইস্তি'যান, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা. বি., হাদীস নং-৩৭০৭

মালিকী ইমামগণের মতে, আল্লাহর নাম ব্যবহার করে যেমন 'সুবহানাল্লাহ' বা 'আল্লাহু আকবার' বা 'আল-হামদু লিল্লাহ' বা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে অনুমতি প্রার্থনা করা মাকরূহ। কেননা এমতাবস্থায় আল্লাহর নামকে যিক্র হিসেবে নয়; বরং অনুমতি গ্রহণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, যা তাঁর সাথে বেয়াদবি করার নামান্তর।[৪৪]

ক. ১২. অনুমতি প্রার্থনা করার সময় দরজার মুখোমুখি দাঁড়ানো উচিত নয়

অনুমতি চাওয়ার সময় যদি দরজা খোলা অবস্থায় থাকে, তা হলে অনুমতি প্রার্থী দরজার মুখোমুখি দাঁড়াবে না; বরং ডানে কিংবা বামে সরে দাঁড়াবে।[৪৫] আর যদি দরজা বন্ধ থাকে বা দরজায় পর্দা লাগানো থাকে, তা হলে যেখানে ইচ্ছা দাঁড়িয়ে অনুমতি প্রার্থনা করতে পারবে। তবে উত্তম হলো- এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করা, যাতে ঘরের ভেতরে দৃষ্টি না পড়ে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট মুফাসসির আবূ 'আবদিল্লাহ আল-কুরতুবী [মৃ. ৬৭১ হি.] রহ. বলেন,

> يجب عليه أن يأتي الباب ويحاول الإذن على صفة لا يطلع منه على البيت لا في إقباله ولا في انقلابه.
>
> **ওয়াজিব হলো দরজার পাশে এসে এমন জায়গা থেকে অনুমতি প্রার্থনা করা, যা থেকে ঘরের অবস্থা দেখা যাবে না, সামনে থেকেও দেখা যাবে না, ফিরলেও দেখা যাবে না।**[৪৬]

আবদুল্লাহ ইবনু বুস্‌র রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ أَوِ الأَيْسَرِ وَيَقُولُ « السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ». وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ سُتُورٌ.
>
> যখন রাসূলুল্লাহ স. কোনো ব্যক্তির ঘরের দরজায় গিয়ে পৌঁছতেন, তখন তিনি দরজার মুখোমুখি দাঁড়াতেন না; বরং তার ডান কি বাম পাশে সরে দাঁড়াতেন এবং দুবার আসসালামু আলাইকুম বলতেন। এর কারণ হলো, তখনকার ঘরের দরজাসমূহে পর্দা থাকতো না।[৪৭]

এ প্রসঙ্গে হুযাইল রা. থেকেও একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, একবার সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রা. রাসূলুল্লাহ স.-এর খিদমতে এসে দরজার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনুমতি প্রার্থনা করতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ স. তাঁকে বললেন,

---

৪৪. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৫০ (সূত্রঃ *আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী*, খ. ২, পৃ. ৪২৭)

৪৫. ড. আবদুল কারীম যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫০০

৪৬. ইমাম আল-কুরতুবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১২, পৃ. ২২০

৪৭. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : কাম মাররাতান ইয়ুসাল্লিমুর রাজুলু..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫১৮৮

هَكَذَا عَنْكَ أَوْ هَكَذَا فَإِنَّمَا الاِسْتِئْذَانُ مِنَ النَّظَرِ.

তোমার পক্ষ থেকে এরূপ আচরণ! অনুমতি চাওয়ার বিধান তো এজন্যই যে, ভেতরে যেন চোখ না পড়ে।[৪৮]

আমীরুল মু'মিনীন উমার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَنْ مَلأَ عَيْنَيْهِ مِنْ قَاعَةِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَدْ فَسَقَ

যে ব্যক্তি অনুমতি দেয়ার আগে ঘরের ভেতরে দৃষ্টি দিলো, সে পাপ করলো।[৪৯]

ক. ১৩. পরিচয় পেশ করার সময় সুস্পষ্টভাবে নাম উল্লেখ করা বা পরিচয় প্রদান করা

ঘরে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি প্রার্থনার সময় অথবা ভেতর থেকে পরিচয় জানতে চাইলে সুস্পষ্টভাবে নিজের নাম বলতে হবে অথবা পরিচয় দিতে হবে। জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ্ রা.-এর বর্ণনা[৫০] থেকে জানা যায় যে, পরিচয় জানতে চাইলে স্পষ্টভাবে নাম না বলা বা 'আমি' বলা বা চুপ করে থাকা সমীচীন নয়। উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারগণ বলেছেন, 'আমি' শব্দ থেকে কোনো ধরনের স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় না। পরিচয় জানতে চাইলে নাম বলা উচিত। তবে যদি কেউ 'আমি অমুক' বলে উত্তর দেয়, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। বর্ণিত আছে, একবার উম্মু হানী রা. রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট প্রবেশ করতে চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ স. তাঁর পরিচয় জানতে চেয়ে বললেন, ইনি কে? তখন উম্মু হানী রা. বলেন, 'আমি উম্মু হানী'।[৫১] উল্লেখ্য, প্রয়োজনে পরিচয় স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে নিজের পদ ও মর্যাদার কথা উল্লেখ করা দূষণীয় নয়, যদিও তাতে বাহ্যত আত্মপ্রশংসার ছাপ দেখা যায়। যেমন- নিজের পরিচয় পেশ করতে বলবে, আমি অমুকের পিতা, আমি বিচারপতি অমুক, আমি অধ্যাপক অমুক। তবে এ ক্ষেত্রে উত্তম হলো, পরিচিত নাম বা পদবি অথবা মর্যাদাসহ নিজের নাম উল্লেখ করা।[৫২]

---

৪৮. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : আল-ইস্তি'যান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫১৬৭

৪৯. ইমাম বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, অধ্যায় : আল-ইস্তি'যান, পরিচ্ছেদ : আন-নাযর ফিদ দুওর, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১০৯২; ইমাম বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, পরিচ্ছেদ : কাইফিয়াতুল ওয়াকূফ 'আলা বাবিদ দার..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৮৪৪২

৫০. ইমাম আত-তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ইস্তি'যান, পরিচ্ছেদ : আত-তাসলীম কবলাল ইসতি'যান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৭১১

৫১. ইমাম বুখারী, *আস-সাহীহ*, অধ্যায় : আবওয়াবুল জিযইয়াহ, পরিচ্ছেদ : আমানুন নিসা'..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩০০০

৫২. ইমাম আন-নাবাবী, *আল-মিনহাজ শারহ সাহীহি মুসলিম*, বৈরূত, দারু ইহয়াতিত তুরাছ, ১৩৯২ হি., খ. ১৪, পৃ. ১৩৫

ব্যবস্থারই লক্ষ্য কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।[৫] কিন্তু এগুলোর আলোকে সৃষ্ট ব্যাংকব্যবস্থা উপহার দিয়েছে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্যহীনতা, অর্থনীতির ঘন ঘন ওঠানামা, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, লেনদেন ঘাটতি, শেয়ার বাজারে অস্থিতিশীলতা, নবায়ন অযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পত্তি নিঃশেষ হওয়া, ক্রমবর্ধমান চাপ, উত্তেজনা, দ্বন্দ্ব সংঘাত, হতাশা, অপরাধ প্রবণতা, নেশা, মাদকাসক্তি, বিবাহ বিচ্ছেদ, নারী ও শিশু নির্যাতন, মানসিক অশান্তি, আত্মহত্যা, বিভেদ ইত্যাদি।[৬] অথচ এগুলোর পেছনে ব্যাংক অনেকাংশেই দায়ী। এর বিপরীতে ইসলাম এমন এক ব্যাংকিং ব্যবস্থার ধারণা পোষণ করে, যা বিদ্যমান ব্যবস্থাগুলো থেকে মৌলিকভাবে আলাদা এবং যা প্রতিষ্ঠা করে ভ্রাতৃত্ব, একতা ও ন্যায়বিচার, দূর করে ধনী-গরীব বৈষম্য এবং উপহার দেয় একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থা, স্থিতিশীল অর্থনীতি আর সাম্যের সমাজ।[৭]

২. ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা

ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যার উদ্দেশ্য, মূলনীতি এবং কর্মপদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামী শরীয়াহর সকল নীতিমালা মেনে চলে এবং তার সকল কার্যক্রমে সুদের লেনদেন সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে।[৮]

মালয়েশিয়ার ইসলামী ব্যাংকিং আইন ১৯৮৩ অনুসারে "ইসলামী ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি কোম্পানী যা ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসায় নিয়োজিত;... ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসায় হচ্ছে এমন এক ধরনের ব্যবসা যার লক্ষ্য এবং কার্যক্রমের এমন কোন উপাদান নেই যা ইসলাম অনুমোদন করেনি"।[৯]

---

৫. M.Umar Chapra, The Need for a New Economic System, *Review of Islamic Economics,* Leicester, UK : 1991, Vol-1, No-1, p. 47

৬. এম ওমর চাপড়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮

৭. মুফতী তকী উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি : সমস্যা ও সমাধান,* ঢাকা : মাকতাবুল আশরাফ প্রকাশনী, পৃ. ২-৮

৮. ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (Organization of Islamic Conference-OIC) কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে "Islami Bank is a financial institution whose statutes, rules and procedures expressly state its commitment to the principles of Islamic Shariah and to the bannung of the receipt and payment of interest of any of its operations"। বিস্তারিত জানতে পড়ুন M Ali and A. Sarkar, *"Islamic Banking : Picnciples and operational Methdodology"* Thoughts on Economics, vol. 5, No. 3 & 4, July-December 1995, pp. 20-25;

৯. অ্যাক্ট নং- ২৭২, ইসলামিক ব্যাংকিং আইন মালয়েশিয়া ১৯৮৩ অনুসারে "Islamic bank is a company which carries on Islamic banking business...Islamic

ডক্টর জিয়াউদ্দীন আহমদের মতে "ইসলামী ব্যাংকিং হলো একটি নীতিগত ধারণা এবং এটিকে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যাংকিং ধরা যায়।"

উপরের সংজ্ঞাসমূহ থেকে এটি পরিষ্কার হয় যে, ইসলামী ব্যাংকিং আর্থিক মধ্যস্থতার এমন একটি পদ্ধতি, যা তার লেনদেনে সুদ গ্রহণ ও প্রদান করে না এবং এর কার্যাবলি এমনভাবে পরিচালনা করে, যাতে ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব হয়। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকিং একটি নতুন ব্যাংকিং ধারণাকে বাস্তবে রূপ দেয়, যাতে তা ফাইন্যান্স এবং অন্যান্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আর বিধিবিধান কঠোরভাবে মেনে চলে। এটি এমন এক ব্যাংকিং পদ্ধতি যা লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই লেনদেনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো লাভ লোকসানে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনীতিতে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।

৩. ইসলামী ব্যাংকিং-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামী ব্যাংকিং তার নীতি, কর্মসূচি ও কর্মধারার মাধ্যমে যেসব মৌলিক আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জন করতে চায় সেগুলো হলো[১০] :

ক) সম্পদের ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করার মাধ্যমে অর্থনীতিতে অন্যায়, অবিচার, জুলুম, শোষণ ও বৈষম্য দূর করা;

খ) অর্থনীতিতে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও লেনদেনের অন্য সব ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় ভারসাম্য আনয়ন;

গ) মানব সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের সুষ্ঠু ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ, তাঁদের দুঃখ মোচন ও জীবনমানের উন্নয়ন;

ঘ) সুদের সর্বনাশা কুফল থেকে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে মুক্ত করা এবং আয়ের উৎস হিসেবে শ্রমের মর্যাদা পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করা;

ঙ) ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক ভাবধারার মূলোৎপাটন করে ব্যাষ্টিক ও সামষ্টিক কল্যাণের আদর্শ কায়েম।

৪. ইসলামী ব্যাংকিং-এর কর্মনীতি[১১]

ক) শরী'আহ্ মোতাবেক সকল কাজ পরিচালনা করা;

খ) আর্থিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে সুদমুক্ত করা;

---

banking business means banking business whose aims and operations do not involve any element which is not approved by the religion islam." বিস্তারিত জানতে পড়ুন : http://www.bnm.gov.my/documents/act/en_ib_act.pdf

১০. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ৮৩

১১. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪

গ) ব্যাংকিং কার্যক্রমকে জনকল্যাণের লক্ষ্যে পরিণত করা;
ঘ) বিনিয়োগ কার্যক্রমে ইসলামী নীতির অনুসরণ করার কারণে কেবলমাত্র মুনাফাকে অগ্রাধিকার দানের পরিবর্তে সমাজের সাধারণ চাহিদার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিনিয়োগ খাতের অগ্রাধিকার নিরূপণ করা;
ঙ) ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে ন্যায়নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা;
চ) স্বল্প আয়ের লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা;
ছ) মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
জ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা;
ঝ) ইসলামী অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা পালন করা।

৫. ব্যক্তি-সমাজের কল্যাণ ও ইসলাম

মানুষের অর্থনৈতিক আচরণে ধর্ম বিশ্বাসের প্রভাব মূল্যবোধের চেতনা তৈরিতে অনেক বড় ভূমিকা পালন করে। কীভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পাদন করতে হবে, বিশেষত কীভাবে সমাজের কল্যাণ সাধন সম্ভব হবে তার প্রেসক্রিপশন ইসলাম দিয়েছে সুনির্দিষ্টভাবে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে "সম্পদের মালিক স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা"[১২] এবং "এই অর্থ-সম্পদ সমাজের কল্যাণের জন্যই ব্যবহার করতে হবে"।[১৩] মানুষ প্রকৃতিগতভাবে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণেই ব্যক্তি মানুষের সুবিধা-অসুবিধার সামাজিকীকরণে সবাই সবাইকে দেখবে- এটিই মনুষ্যত্ব। এই সামাজিক সম্পর্ক সর্বদাই প্রতিউৎপাদক বিধায় ধনিক শ্রেণি তাঁর নিজ স্বার্থেই অসহায় এবং দুর্বলদের পাশে দাঁড়াবে- এটিই ইসলামের শিক্ষা। যে ব্যক্তি এই শিক্ষাকে প্রতিপালন করে না অথবা অস্বীকার করে, সে মূলত তার ধর্মকেই অস্বীকার করে। এ জন্যই আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ﴾

যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছু রিয্ক দিয়েছেন তা থেকে কিছু অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করো- তখন তারা বলে আমরা কি তাদেরকে খাওয়াবো যাদেরকে চাইলে আল্লাহই খাওয়াতেন[১৪]?

---

১২. আল্লাহ্ তাআলা বলেন, وَمَالَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ "তোমাদের এ কি হলো, তোমরা কেন আল্লাহর পথে ব্যয় করতে চাও না, অথচ আসমান ও জমীনের সকল সম্পদের মালিক স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা।" আল-কুরআন, ৫৭ : ১০

১৩. আল্লাহ্ তাআলা বলেন, هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً "তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি এই পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের ব্যবহারের জন্যই তৈরি করেছেন।" আল-কুরআন ২ : ২৯;

১৪. আল-কুরআন, ৩৬ : ৪৭

তাদের জন্য আল্লাহর সাবধানবাণী :

﴿ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴾

সে তো সেই ব্যক্তি যে ইয়াতিমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় এবং মিসকীনকে খাবার দিতে উৎসাহিত করে না।[১৫]

এটি আরো পরিষ্কার হয় হাদীসের বক্তব্যের মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন,

الخلق كلهم عيال الله فأحب الخلق إلى الله انفعهم لعياله

সকল সৃষ্টিই হল আল্লাহর প্রতিপাল্য (স্বরূপ অর্থাৎ তাঁর ওপর একান্ত নির্ভরশীল)। আর আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় সৃষ্টি হল, যে তার প্রতিপাল্যদের সর্বাধিক উপকার করে।[১৬]

সমাজে কিছু লোক থাকে যারা নিজের অর্থ নিজেরা উপার্জনে একেবারেই অক্ষম। কিন্তু তাদের আত্মমর্যাদা তাদেরকে অন্যের পেছনে লেগে থাকা থেকে বিরত রাখে। লোকেরা তাদেরকে স্বচ্ছল মনে করে। কিন্তু তাদের মুখ দেখেই তাদেরকে চেনা যায়।[১৭] কুরআন বলে, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ ব্যয় করো তোমাদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য।[১৮] তাই ধনীদের সম্পদে রয়েছে গরীবের অধিকার।[১৯] এটি ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবহারের অন্যতম মূলনীতি।[২০] এটি মানুষের মনে বদ্ধমূল করে যে, সৃষ্টির সহযোগিতার মাধ্যমে মানুষ মূলত সৃষ্টিকর্তাকেই সহযোগিতা করে।

---

১৫. আল-কুরআন, ১০৭ : ২-৪

১৬. ইমাম আত-তাবারানী, *আল-মুজামুল কাবীর,* আল-মাওসিল : মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ১৪০৪ হি./১৯৮৩ খ্রি., হাদীস নং-১০০৩৩; হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফ ওয়াল মাওযূআহ ওয়া আছারুহাস সায়্যি ফিল উম্মাহ,* রিয়াদ : দারুল মাআরিফ ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি., হাদীস নং-১৯০০

১৭. আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ

"কিছু গরীব মানুষ আছে যারা আল্লাহর পথে নিজেদেরকে এমনভাবে ব্যাপৃত করে রেখেছে যে, তারা নিজেদের জন্য যমীনের বুকে চেষ্টা সাধনা করতে পারে না, আত্মসম্মানের কারণে অন্যের কাছে কিছু চায় না বলে অজ্ঞ লোকরো তাদেরকে স্বচ্ছল মনে করে, কিন্তু তুমি এদের বাহ্যিক চেহারা দেখেই এদের সঠিক অবস্থা বুঝতে পারো।" আল কুরআন, ২ : ২৭৩

১৮. আল্লাহ্ তাআলা বলেন, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ আল কুরআন, ২ : ২১৫

১৯. আল্লাহ্ তাআলা বলেন, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ "তাদের ধন সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিত লোকদের অধিকার আছে।" আল কুরআন, ৫১ : ১৯

২০. সাইয়্যেদ আবুল আলা, *ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি,* ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, পৃ. ২০-৩০

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ প্রকৃত আয় থেকেই তার মৌলিক চাহিদা পূরণ করে থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তির মৌলিক প্রকৃত আয় এতোই ক্ষুদ্র যে, তিনি তার জীবন ধারণের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসার ব্যয়ভার মেটাতে অক্ষম, তিনি চেয়ে থাকেন বিত্তবানদের মুখের দিকে, চেয়ে থাকেন সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের দয়ার দিকে। তারা তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারেন না যদি অন্য কেউ তাঁদের ভাগ্য পরিবর্তনে এগিয়ে না আসেন। কুরআন এ জন্য বলে, অর্থ যেন শুধু ধনীদের মাঝেই আবর্তিত না হয়।[২১]

ইসলামের দাবি হল, প্রত্যেক মুসলিম তাঁর জীবন পরিচালনায় শরী'আহ্‌কে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিবে। শরী'আহ্ অনুসৃত জীবন বিধানই মনুষ্যত্ব তৈরির আইন, যা মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক আচরণে নৈতিক মূলনীতি ও মূল্যবোধ অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করে দেয়। এটিই একজন মানুষের মধ্যে স্রষ্টার প্রতি ভয়, ভক্তি ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে। মানুষ বুঝতে পারে ব্যক্তির সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক কী, ব্যক্তির সাথে সমাজ আর পৃথিবীর সম্পর্ক কী। এভাবেই সৃষ্টি হয় ন্যায়পরায়ণতা, যা একটি কল্যাণময় সমাজ তৈরির খুঁটি।

৬. মাকাসিদুশ শরী'আহ্ (Objective of Shariah)

শরী'আর গূঢ় উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে তাদের আকিদা-বিশ্বাস, জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি, বংশধর ও সম্পদের সংরক্ষণ করা। যা কিছু এই পাঁচটি বিষয় সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান করে তাই জনকল্যাণমূলক কর্ম বলে গণ্য এবং সেটাই কাম্য।[২২]

শরী'আর ভিত্তি হচ্ছে মানুষের জ্ঞান এবং পার্থিব জগত ও পরকালে জনগণের কল্যাণ সাধন। আর কল্যাণ নিহিত রয়েছে সার্বিক ন্যায়বিচার, দয়া, সুখ-সমৃদ্ধি ও জ্ঞানের মধ্যে। যেখানে ন্যায়বিচারের পরিবর্তে নির্যাতন, দয়ার পরিবর্তে কঠোরতা, কল্যাণের পরিবর্তে কার্পণ্য এবং জ্ঞানের পরিবর্তে মূর্খতা স্থান পায়, সেখানে শরী'আর কিছু করণীয় নেই।[২৩]

ফালাহ্ শব্দটি কুরআনে ৪০ বার এসেছে যার অর্থ কল্যাণ। ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মিক উন্নতি হল মানুষের কল্যাণের অপরিহার্য উপাদান। ইমাম গাযালী রহ. বিজ্ঞতার সাথেই মাকাসিদের তালিকায় ঈমানকে শীর্ষে রেখেছেন। কারণ ঈমান হল

---

২১. আল্লাহ্ তাআলা বলেন, كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ "সম্পদ এমনভাবে বণ্টন করো না যেন তা শুধু ধনীদের মাঝেই আবর্তিত হয়।" আল কুরআন, ৫৯ : ৭

২২. এম ওমর চাপড়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭

২৩. *প্রাগুক্ত*

মানব কল্যাণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা মানুষের সম্পর্ককে একটি যথার্থ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে এবং মানুষের সকল কল্যাণ নিশ্চিত করতে সহায়তা করার জন্য পরস্পরের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ ও সযত্ন মিথষ্ক্রিয়ায় সক্ষম করে তোলে। এতে আরো রয়েছে নৈতিক পরিশোধন পদ্ধতি, যাতে ভ্রাতৃত্ব ও আর্থ-সামাজিক সুবিচারের মানদণ্ড অনুসারে সম্পদের বরাদ্দ ও বিতরণ করা হয় এবং একটি উদ্বুদ্ধকরণ ব্যবস্থায় চাহিদা পূরণ এবং আয় ও সম্পদের সুবিচার ভিত্তিক বণ্টনের লক্ষ্যের সাথে সম্পৃক্ত করে।

মানবীয় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তথা লেনদেন, অর্থ গ্রহণ, প্রদান, বণ্টন, বিনিয়োগ ব্যবস্থা, লাভ, ক্ষতি নির্বিশেষে সর্বত্র ঈমানকে অনুপ্রবিষ্ট করা না গেলে সম্পদের বরাদ্দ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে দক্ষতা ও সমতা প্রতিষ্ঠা করা যাবে না এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা, অর্থনৈতিক অস্থিরতা, বিবাদ, উত্তেজনাও দূর করা যাবে না।[২৪] ইমাম গাযালী রহ. সম্পদকে তালিকার সর্বনিম্নে স্থান দিয়েছেন। কারণ তা নিজেই চূড়ান্ত বিষয় নয়। সেটি একটি মাধ্যম মাত্র, যা মানব কল্যাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্পদ নিজে কোন সাহায্য করতে পারে না, যদি তার বরাদ্দ দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে করা হয়।

অর্থের সঠিক ব্যবহার দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে ব্যবহার না করার পরিণাম হবে অবিচার, ভারসাম্যহীনতা ও পরিবেশগত অনাচার, যা পরবর্তী প্রজন্মের কল্যাণকে সংকুচিত করবে। মাঝখানের তিনটি (জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি ও বংশধর) লক্ষ্য সরাসরি মানুষের নিজের সাথে সম্পর্কিত। পর্যাপ্ত খাদ্য, পুষ্টি, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা সকল কিছুই জীবন ও বংশধর রেখে যাওয়ার জন্য অপরিহার্য। বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির জন্য দরকার উপযুক্ত পরিবেশ, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা সেবা। মাকাসিদের উপলব্ধি থেকে যে দেশের অর্থনীতি যতো দূরে, সে দেশের মোট উৎপাদন বাড়লেও দারিদ্র্য কমে না।[২৫]

৭. সমাজকল্যাণ : ইসলামী ব্যাংকিং পরিপ্রেক্ষিত

ইসলামী ব্যাংকিং এর জন্মই হয়েছিল আর্থ-সামাজিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য। ইসলামী ব্যাংক মূলত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমাজের কল্যাণে ভূমিকা

---

২৪. *প্রাগুক্ত*

২৫. J. Alteman and S. Hunter, *The Idea of Philanthropy in Muslim Contexts,* Washington DC : The Centre of Strategic and International Studies, 2004, p. 3

রাখার ক্ষেত্রে উপাদান ও প্রক্রিয়া কী হতে পারে এতদসম্পর্কীয় তাত্ত্বিক ও বাস্তবসম্মত গবেষণা অনুসারে সামাজিক দায়দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা মূলত তিন ধরনের :[২৬]

৭.১ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও এর আলোকে দায়বদ্ধতা;
৭.২ মানুষের সাথে সম্পর্ক ও দায়বদ্ধতা;
৭.৩ পরিবেশের সাথে সম্পর্ক ও এর আলোকে দায়বদ্ধতা।

এই তিন ধরনের সম্পর্ক ও দায়বদ্ধতার আলোকে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানসমূহ পাঁচ ধরনের মূলনীতির ওপরে কাজ করে :

ক) আল্লাহর একত্ব;[২৭]
খ) খিলাফাতের দায়িত্ব;[২৮]
গ) আর্থ সামাজিক ন্যায়বিচার;[২৯]
ঘ) সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব;[৩০]
ঙ) মানুষের কল্যাণ সাধন।[৩১]

কুরআন হাদীসের আলোকে গবেষণার নিরিখে এই মূলনীতিসমূহ ছয়টি বিষয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়[৩২] :

অ) শরী'আর পরিপালন;

---

২৬. Muhammed Yasir Yusuf and Zakaria Bin Bahari, *"Islamic Corporate Social Responsibility in Islamic Banking; Towards Poverty Alleviation"*. Centre for Islamic Economics & Finance, 8th International Conference in Islamic Economics & Finance, 2007, Vol 1, p. 11.

২৭. আল্লাহ্ তাআলা বলেন, قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ "বলো তিনিই আল্লাহ্ যিনি এক ও অদ্বিতীয়।" আল-কুরআন, ১১২ : ১

২৮. আল্লাহ্ তাআলা বলেন,
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
"তিনি পৃথিবীতে তার প্রতিনিধি প্রেরণ করেছেন এবং একজনকে আরেকজনের থেকে কিছু বেশি মর্যাদা দিয়েছেন এইজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান।" আল-কুরআন, ৬ : ১৬৫

২৯. আল্লাহ্ তাআলা বলেন, وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ "তোমরা অবশ্যই ন্যায়বিচার করবে, আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালোবাসেন।" আল-কুরআন, ৪৯ : ৯

৩০. আল্লাহ্ তাআলা বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ "মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমরা ভাইদের মাঝে মীমাংসা করে দাও।" আল-কুরআন, ৪৯ : ১০

৩১. আল্লাহ্ তাআলা বলেন, أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ "সত্যিকার অর্থে এরাই হচ্ছে সেই মানুষ যারা কল্যাণকর কাজে সদা তৎপর ও অগ্রগামী।" আল-কুরআন, ২৩ : ৬১

৩২. Muhammed Yasir Yusuf and Zakaria Bin Bahari, *ibid*, p. 12

আ) সাম্যের নীতি অবলম্বন;
ই) কাজের প্রতি আন্তরিকতা;
ঈ) কাজের পরিবেশ সৃষ্টি;
উ) পরিবেশ সুরক্ষা;
ঊ) উদ্যোগ গ্রহণ।

এই ছয়টি নির্ণায়ক যে সকল উপাদান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় তা নিম্নরূপ :

৭. অ) শরী'আহ্ পরিপালন

ক) শরী'আহ্সম্মত ইসলামী ব্যাংকিং প্রোডাক্ট-এর সঠিক ব্যবহার;[৩৩]
খ) বিনিয়োগে শরী'আর পরিপালন;[৩৪]
গ) হালাল খাতে বিনিয়োগ;[৩৫]
ঘ) সন্দেহজনক মুনাফা এড়িয়ে চলা;[৩৬]
ঙ) গ্রাহক নির্বাচনে শরী'আর পরিপালন।[৩৭]

এই পাঁচটি উপাদান কুরআন অনুসৃত বিধি অনুসারে ইসলামী ব্যাংককে অর্থ সংগ্রহ ও বিনিয়োগের সীমা নির্ধারণ করে দেয়।

৭. আ) সাম্যের নীতি অবলম্বন

ক) ভ্রাতৃত্ব ও মূল্যবোধ;[৩৮]
খ) সেবায় উৎকর্ষ;[৩৯]
গ) সকলের প্রতি সমান দৃষ্টিকোণ;[৪০]
ঘ) সমান সুযোগের ব্যবস্থা।[৪১]

---

৩৩. *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি : শরীয়ার নীতিমালা*, ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত , ২০১১, পৃ. ২-৭

৩৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২-৬

৩৫. Elmelki Anas, *Ethical Investment and the Social Responsibilities of the Islamic Banks*, International Business Research, 2009, Vol 2, No. 2, pp. 126-128

৩৬. হাবীবুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইকবাল, *উপার্জন : ইসলামী দৃষ্টিকোণ*, ইসলাম হাউজ পাবলিকেশন ২০১৪, পৃ. ৩৮

৩৭. গ্রাহক নির্বাচনে ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইমাম শাতিবীর মতামতকে অনুসরণ করে। অর্থাৎ গ্রাহকের প্রয়োজনকে ইসলামী ব্যাংক জরুরীয়াত, হাজিয়াত ও তাহ্সানিয়াত এই তিন গ্রুপে ভাগ করে। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন : Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) standard- 7

৩৮. Amna Javed, *ibid*, p. 422

৩৯. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, *ব্যাংকে গ্রাহক সেবা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন*, ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশনী, পৃ. ৪৩

৪০. Amna Javed, *ibid*, p. 423

৪১. *ibid*

এই চারটি উপাদান ইসলামী ব্যাংকিং-এ স্টেকহোল্ডারদের সাথে আচরণের মূলনীতি ঠিক করে দেয়।

৭. ই) কাজের প্রতি আন্তরিকতা

ক) বিশ্বস্ততা;[৪২]
খ) সীমাবদ্ধতার মাঝেও দায়িত্ব নিয়ে কাজ করা;[৪৩]
গ) গ্রাহকের সাথে সকল চুক্তির বাস্তবায়ন;[৪৪]
গ) স্বচ্ছতা;[৪৫]
ঘ) সময়োপযোগী ভূমিকা পালন ও দক্ষতার প্রতিফলন;[৪৬]
ঙ) মন্দ বিনিয়োগের লাগাম টানা;[৪৭]
চ) কাজের সমন্বয়;

---

৪২. আল্লাহ্ তাআলা বলেন, إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ "এমন লোককে মজুর হিসেবে নিয়োগ করো, যে শারীরিকভাবে শক্তিশালী ও চারিত্রিক দিক থেকে বিশ্বস্ত"। আল-কুরআন, ২৮ : ২৬

৪৩. ব্যাংকার তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দিবে এটা তার কর্তব্য। আর কর্তব্য সুচারুভাবে সম্পাদন করলে তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কারের কথা রাসূল স. বলেছেন-

ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ (ومنها) وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ

"তিন শ্রেণির লোকের দ্বিগুণ সওয়াব হবে। তার মধ্যে এক শ্রেণি হল যে নিজের মালিকের হক আদায় করে এবং আল্লাহর হকও আদায় করে।"

ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ইলম, পরিচ্ছেদ : তালীমুর রজুলি আমাতাহু ওয়া আহলাহু, বৈরূত : দারু ইবনি কাছীর, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., হাদীস নং-৯৭

৪৪. আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর এবং তোমরা আল্লাহকে তোমাদের যামিন করে শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ কর না। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন। আল-কুরআন, ১৬ : ৯১

৪৫. হাবীবুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইকবাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯-২০

৪৬. আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ

তোমাদের কেউ যখন কোন কর্ম সম্পাদন করে তখন আল্লাহ চান যে, ঐ কর্মটি যেন সে উৎকর্ষের সাথে/সুদক্ষভাবে সম্পাদন করে।

আবু ইয়ালা আল-মাওসিলী, *আল-মুসনাদ*, অধ্যায় : মুসনাদে আয়শা রা., দিমাশক : দারুল মামুন লিত-তুরাছ, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি., হাদীস নং-৪৩৮৬। হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *আস-সিলসিলাতুল আহাদীছিছ সহীহাহ*, রিয়াদ : দারুল মা'আরিফ, তা.বি., হাদীস নং-১১১৩

৪৭. Amna Javed, *ibid*, p. 422

ছ) নিরপেক্ষ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি;[৪৮]
জ) জবাবদিহিতা।[৪৯]

মুসলিম মাত্রই দায়িত্বশীল তার প্রত্যেককেই তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে।[৫০] তাই ইসলামী ব্যাংকার শুধু তার নিজের ও সহকর্মীদের প্রতিই দায়িত্বপরায়ণ হবে না, বরং "বেশি দায়িত্বপরায়ণ হবেন আল্লাহর প্রতি"।[৫১] এই কারণেই হাদীসে এসেছে,

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে থাকবেন।[৫২]

রাসূলুল্লাহ স. আরো বলেছেন,

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

আল্লাহ ঐ উদার ব্যক্তির প্রতি রাহমাত বর্ষণ করেন, যে বেচা-কেনায় এবং নিজের দাবি আদায়ের সময় নম্রতা প্রদর্শন করে।[৫৩]

৭. ঁ) কাজের পরিবেশ সৃষ্টি

ক) অফিসে কাজের পরিবেশ ও স্বাচ্ছন্দ্য;[৫৪]
খ) মত প্রকাশের অধিকার ও স্বাধীনতা;

---

৪৮. আল্লাহ্ তাআলা বলেন, فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ "তোমরা কল্যাণকর কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা কর।" আল-কুরআন, ২ : ১৪৮

৪৯ আল্লাহ্ তাআলা বলেন, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ "যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ নেক আমল করবে সে তার প্রতিদান পাবে। আর যে বিন্দু পরিমান খারাপ আমল করবে সেও তার প্রতিদান পাবে।" আল-কুরআন, ৯৯ : ৭-৮

৫০. রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-'ইতক, পরিচ্ছেদ : আল-আবদু রা'আ ফী মালি সায়্যিদিহী, বৈরূত : দারু ইবনি কাছীর, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., হাদীস নং- ২৪১৯

৫১. আল্লাহ্ তাআলা বলেন, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا "আল্লাহ তোমাকে যে অনুগ্রহ দান করেছেন তা দ্বারা পরকাল তালাশ করো আর দুনিয়ায় নিজের অংশ ভুলে যেও না।" আল-কুরআন, ২৮ : ৭৭

৫২. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান,* তাহকীক : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ও অন্যান্য, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, পরিচ্ছেদ : আত-তুজ্জার ওয়া তাসমিয়াতুন নাবিয়্য স. ইয়্যাহুম, বৈরূত : দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরাবী, হাদীস নং-১২০৯, হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف)

৫৩. ইমাম বুখারী, *আস-সাহীহ,* অধ্যায় : বুয়ূ', পরিচ্ছেদ : আস সুহূলাতু ওয়াস-সামাহাতু ফশ শিরা ওয়াল বাই', প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৯৭০

৫৪. ওমর রা. সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন, সবচেয়ে ভাল শাসনকর্তা সে-ই যার অধীন সবাই স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরাপত্তায় থাকে। আর সবচেয়ে খারাপ শাসনকর্তা সে-ই যার অধীনে সবাই অশান্তিতে থাকে। বিস্তারিত জানতে পড়ুন : ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, *ইসলামে শ্রমিকের অধিকার,* ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ২০০০ পৃ. ১১৭-১১৮।

গ) উপযুক্ত পারিশ্রমিক;[৫৫]
ঘ) প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা;
ঙ) কর্মঘণ্টা;[৫৬]
চ) লাভ ক্ষতির ঝুঁকি বহন;[৫৭]
ছ) কর্মকর্তা কর্মচারীদের বীমা সুবিধা;[৫৮]

ইসলাম প্রত্যেকটি কাজেই সর্বজনীন কল্যাণকে প্রাধান্য দেয়। এ কারণেই ইসলামী ব্যাংকসমূহ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনে সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে।

৭. উ) পরিবেশের সুরক্ষা

ক) বিনিয়োগের পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ;[৫৯]
খ) পরিবেশ সুরক্ষার অন্যান্য বিষয় চিহ্নিতকরণ;[৬০]
গ) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিবেশ সুরক্ষার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান;
ঘ) পুনঃব্যবহারযোগ্য বস্তুর যথাযোগ্য ব্যবহার।

ইসলামী ব্যাংকিং-এ মানুষের সাথে পরিবেশের সম্পর্ক আলাদাভাবে দেখার সুযোগ নেই। পরিবেশের সুরক্ষা মূলত মানুষেরই সুরক্ষা।

৭. উ) উদ্যোগ গ্রহণ

ক) উদ্যোক্তা বাছাই;[৬১]

---

৫৫. রাসূল স.বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে থাকব যার মধ্যে একজন হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে কাউকে কর্মে নিয়োগ করার পর কাজ বুঝে নিয়েছে অথচ উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেয়নি। ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, পরিচ্ছেদ : ইছমু মান বাআ হুররান, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-২১১৪

৫৬. কর্মঘণ্টা নির্ধারিত হবে ন্যায়বিচারের আলোকে। এ ক্ষেত্রে কর্মকর্তা-কর্মচারীর দৈহিক অবস্থা, বয়স এবং মানবিক দিক অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। বিস্তারিত জানতে পড়ুন : ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

৫৭. Amna Javed, *ibid,* pp. 420-423

৫৮. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৯৬, পৃ. ৮৯-৯৮

৫৯. আল্লাহ্ তাআলা বলেন, وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ "যারা যমীনের শস্যক্ষেত্র বিনাশ করে, জীবজন্তুর বংশ বিনাশ করে, এই ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের আল্লাহ পছন্দ করেন না"। আল-কুরআন ২ : ২০৫

৬০. *প্রাগুক্ত*

৬১. Rania Kamla & Hussain G. Rammal, *Social Reporting by Islamic Banks: Does Social Justice matter?School of Accounting and Finance;U.K,* 2010, p p. 4-8

খ) সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের পথ খুঁজে বের করা;[৬২]
গ) সমাজকল্যাণমূলক কাজের উদ্যোগ গ্রহণ;[৬৩]
ঘ) ইসলামী ব্যাংকিং প্রোডাক্ট-এর মাধ্যমে সমাজের টার্গেট গ্রুপ-এর উন্নয়ন।[৬৪]

৭. ইসলামী ব্যাংকিং ও সমাজকল্যাণ : একনজরে

বিষয়	উপাদান	বাস্তবায়ন ক্ষেত্র	সমাজকল্যাণের মূলনীতি
শরী'আর পরিপালন	ইসলামী ব্যাংকিং ইনস্ট্রুমেন্ট[৬৫]	কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শেয়ারহোল্ডার	একতা
	বিনিয়োগ	কর্মকর্তা, কর্মচারী, শেয়ারহোল্ডার ও গ্রাহক	একতা, ন্যায়বিচার ও খিলাফাত
	হালাল খাতে বিনিয়োগ	কর্মকর্তা, কর্মচারী, শেয়ারহোল্ডার ও গ্রাহক	একতা, ন্যায়বিচার ও খিলাফাত
	সন্দেহজনক মুনাফা পরিহার	কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শেয়ারহোল্ডার	সমতা ও খিলাফাত
	গ্রাহক নির্বাচন	কর্মকর্তা, কর্মচারী, শেয়ারহোল্ডার, গ্রাহক ও সাধারণ মানুষ	সমতা, খিলাফাত ও ন্যায়বিচার
সাম্যের নীতি অবলম্বন	ভ্রাতৃত্ব ও মূল্যবোধ	কর্মকর্তা, কর্মচারী, শেয়ারহোল্ডার, গ্রাহক ও সাধারণ মানুষ	সমতা, খিলাফাত ও ন্যায়বিচার
	উত্তম সেবা	কর্মকর্তা, কর্মচারী, শেয়ারহোল্ডার, গ্রাহক ও সাধারণ মানুষ	ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়বিচার
	সমান দৃষ্টিভঙ্গি	কর্মকর্তা, কর্মচারী, শেয়ারহোল্ডার, গ্রাহক ও সাধারণ মানুষ	ন্যায়বিচার
	সুযোগের সমতা	কর্মকর্তা, কর্মচারী, শেয়ারহোল্ডার, গ্রাহক ও সাধারণ মানুষ	ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়বিচার ও মাসলাহা
কাজের প্রতি আন্তরিকতা	বিশ্বস্ততা	কর্মকর্তা, কর্মচারী ও গ্রাহক	একতা
	সীমাবদ্ধতার মাঝেও দায়িত্বপরায়ণতা	কর্মকর্তা ও কর্মচারী	ন্যায়বিচার
	চুক্তির বাস্তবায়ন	কর্মকর্তা, কর্মচারী ও গ্রাহক	ন্যায়বিচার
	স্বচ্ছতা	কর্মকর্তা, কর্মচারী, শেয়ারহোল্ডার ও গ্রাহক	একতা
	সময়োপযোগি ভূমিকা	কর্মকর্তা ও কর্মচারী	ন্যায়বিচার
	মন্দ বিনিয়োগের লাগাম টানা	কর্মকর্তা, কর্মচারী ও গ্রাহক	একতা ও ন্যায়বিচার
	কাজের সমন্বয়	কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সাধারণ মানুষ	একতা ও ন্যায়বিচার
	নিরপেক্ষ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি	কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সাধারণ মানুষ	ন্যায়বিচার, ভ্রাতৃত্ব ও মাসলাহা
	জবাবদিহিতা	কর্মকর্তা, কর্মচারী, শেয়ারহোল্ডার, গ্রাহক ও সাধারণ মানুষ	ন্যায়বিচার, ভ্রাতৃত্ব ও মাসলাহা

---

৬২. *ibid*
৬৩. *ibid*
৬৪. M.U. Chapra, *The Future of Economics; An Islamic Perspective*, Leicester, UK : Islamic Foundation, 2000, p. 321
৬৫. Dr. Mohamed Jamaldeen, *Islamic Financial Instrument*. আরো জানতে পড়ুন: http://www.slideshare.net/jmfsaad/islamic-financial-instruments

কাজের পরিবেশ	কর্মক্ষেত্রে পরিবেশ ও স্বাচ্ছন্দ	কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শেয়ারহোল্ডার	একতা, খিলাফত ও ভ্রাতৃত্ব
	স্বাধীন ইচ্ছা	কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শেয়ারহোল্ডার	খিলাফত
	উপযুক্ত পারিশ্রমিক	কর্মকর্তা ও কর্মচারী	ন্যায়বিচার ও ভ্রাতৃত্ব
	শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা, কর্মচারী ও গ্রাহক	খিলাফত
	কর্মঘণ্টা	কর্মকর্তা ও কর্মচারী	ন্যায়বিচার
	লাভ ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণ	কর্মকর্তা, কর্মচারী, শেয়ারহোল্ডার ও সাধারণ মানুষ	ন্যায়বিচার ও ভ্রাতৃত্ব
	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বীমা সুবিধা	কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শেয়ারহোল্ডার	ন্যায়বিচার, খিলাফত ও ভ্রাতৃত্ব
পরিবেশ সুরক্ষা	বিনিয়োগ	কর্মকর্তা, কর্মচারী ও প্রকৃতি	খিলাফত
	পরিবেশ সুরক্ষায় উদ্যোগ	কর্মকর্তা, কর্মচারী, শেয়ারহোল্ডার ও সাধারণ মানুষ	খিলাফত ও একতা
	প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শেয়ারহোল্ডার	খিলাফত ও একতা
	পুনঃব্যবহারযোগ্য বস্তুর সঠিক ব্যবহার	কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শেয়ারহোল্ডার	খিলাফত ও একতা
উদ্যোগ গ্রহণ	উদ্যোক্তা বাছাই	কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শেয়ারহোল্ডার	একতা, খিলাফত ও মাসলাহ
	সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান করা	কর্মকর্তা, কর্মচারী, শেয়ারহোল্ডার ও সাধারণ মানুষ	ভ্রাতৃত্ব ও মাসলাহা
	ওয়েলফেয়ার ফান্ড	কর্মকর্তা, কর্মচারী, শেয়ারহোল্ডার ও সাধারণ মানুষ	ভ্রাতৃত্ব ও মাসলাহা
	সমাজকল্যাণমূলক কাজের উদ্যোগ গ্রহণ	কর্মকর্তা, কর্মচারী, শেয়ারহোল্ডার ও সাধারণ মানুষ	ভ্রাতৃত্ব ও মাসলাহা
	টার্গেট গ্রুপের উন্নয়ন	কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সাধারণ মানুষ	ভ্রাতৃত্ব ও মাসলাহা

ছক ১ : ইসলামের আলোকে সমাজকল্যাণের উপাদান ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে সম্পর্ক[৬৬]

এই সম্পর্ক ও ৩৪ টি উপাদান এমনভাবে পরস্পর সম্পর্কিত যে, একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা করা যায় না। ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানসমূহ সৃষ্টিকর্তা, মানুষ ও প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক ও দায়িত্বের আলোকে উল্লিখিত বিষয়সমূহকে সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে কাঠামোগত উপাদান হিসেবে বিবেচিত করতে পারে। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একতা, খিলাফত, ন্যায়বিচার ও ভ্রাতৃত্ব এই চারটি মূলনীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা, মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি হক আদায়করত একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও কল্যাণ সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখে।

---

[৬৬] Muhammed Yasir Yusuf and Zakaria Bin Bahari, *ibid*
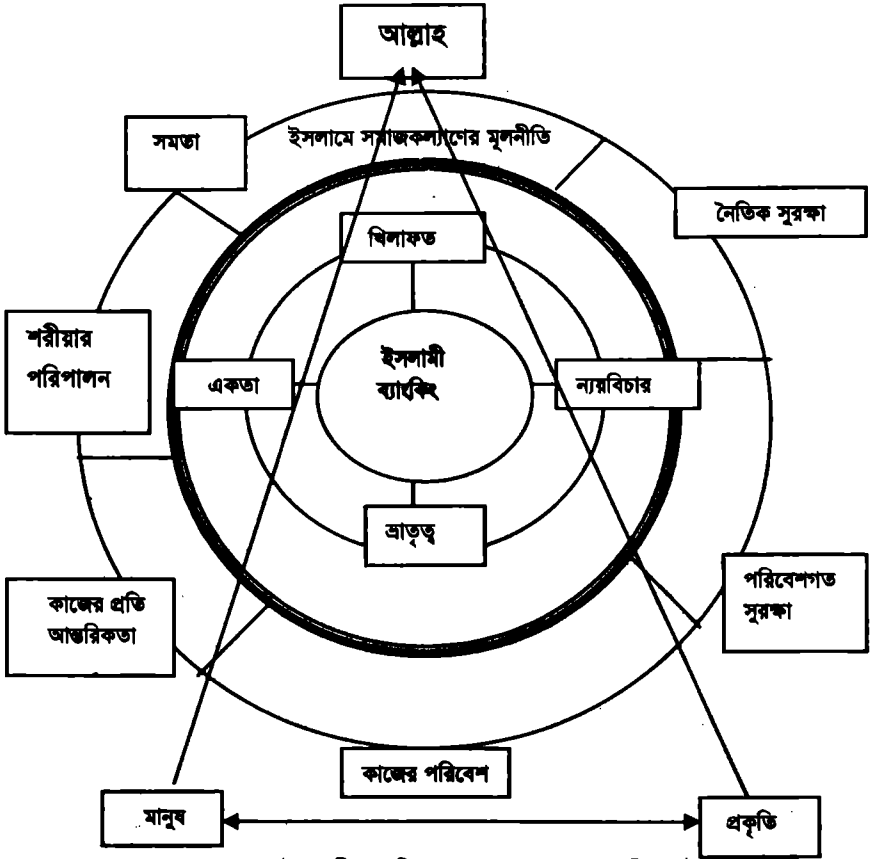
ছক ২ : ইসলামী ব্যাংকিং-এ সমাজকল্যাণের বৈশিষ্ট্য

৯. মানবতার কল্যাণে ইসলামী ব্যাংকার-এর দায়িত্ব

AAOIFI[৬৭] গভর্নেন্স স্ট্যান্ডার্ড ৭ অনুসারে মানবতার কল্যাণে ইসলামী ব্যাংকারের দায়িত্বসমূহ নিম্নরূপ:

ক) প্রয়োজন, গুরুত্ব ও আদলের ভিত্তিতে গ্রাহকের ক্যাটেগরি তৈরি করা;

খ) গ্রাহকের সাথে দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার;

গ) আয়-ব্যয়ে শরী'আর বাধ্যবাধকতা মেনে চলা;

ঘ) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধা, অধিকার আদায় ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা;

ঙ) যাকাত আদায়;

---

৬৭. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.

চ) কর্য হাসান;
ছ) পরিবেশ সহায়ক বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও পরিবেশ বিপর্যয়ে সহায়ক বিনিয়োগের লাগাম টানা;
জ) উত্তম গ্রাহক সেবা;
ঝ) ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ;
ঞ) ওয়াক্ফ ফান্ড গঠন ও এর সঠিক ব্যবহার।

১০. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শক্তি

ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান তার মৌলিক বিধান ও কর্মপদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামী শরী'আর নীতিমালা মেনে চলতে বদ্ধপরিকর এবং কর্মকাণ্ডের সকল পর্যায়ে সুদকে বর্জন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এটি ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের ভিত্তি। ইসলামের আর্থ-সামাজিক মূলনীতির আলোকে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার চেতনা এই প্রতিষ্ঠানের প্রেরণা। ইসলামী শরী'আর নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই ব্যাংক সুদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্ত, যা প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংক থেকে স্বতন্ত্র ও মৌলিক। এই স্বতন্ত্র লক্ষ্য ও অনন্য কর্মকৌশলের মধ্য দিয়ে এ ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ ঘটে।

১০.১ তাওহীদ

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিশ্ব যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই মহান আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়[৬৮] এবং সমস্ত সম্পদের মালিক তিনিই।[৬৯] এই তাওহীদই ইসলামী বিশ্বাসের ভিত্তিমূল। এ ধারণার ওপরই গড়ে ওঠেছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দর্শন এবং তার কর্মকৌশল। আল্লাহ মানুষসহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে একটি উদ্দেশ্য রয়েছে।[৭০] ইসলামী ব্যাংক সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

১০.২ খিলাফত

মানবসত্তা পৃথিবীতে আল্লাহর সম্মানিত প্রতিনিধি[৭১] এবং যার মাধ্যমে তাকে বিশ্বে একটি সম্মানজনক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছে।[৭২] এরপর তাদেরকে একটি লক্ষ্য

---

৬৮. আল্লাহ্ তাআলা বলেন, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "বলো তিনিই আল্লাহ্ যিনি এক ও অদ্বিতীয়।" আল-কুরআন, ১১২ : ১

৬৯. আল্লাহ্ তাআলা বলেন, وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ "আসমান সমূহ ও জমীনের মালিকানা স্বয়ং আল্লাহর।" আল-কুরআন, ৫৭ : ১০

৭০. আল্লাহ্ তাআলা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون "আমি মানুষ ও জিন্ জাতিকে কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" আল-কুরআন, ৫১ : ৫৬

৭১. আল্লাহ্ তাআলা বলেন, إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً "আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করতে চাই।" আল-কুরআন, ২ : ৩০

৭২. আল্লাহ্ তাআলা বলেন, وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا "আমি আদম সন্তানকে আমার সকল সৃষ্টির চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।" আল-কুরআন, ১৭ : ৭০

প্রদান করা হয়েছে এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।[৭৩] ইবাদত বলতে এটিই বোঝানো হয়েছে[৭৪], যার অলঙ্ঘনীয় অনুজ্ঞা হল অন্যান্য মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালন (হাক্কুল ইবাদ), তাদের কল্যাণের জন্য কাজ করা এবং মাকাসিদকে বাস্তবে রূপদান করা। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা খিলাফতের এই দায়িত্বানুভূতি নিয়েই তার সকল কর্মকাণ্ডকে ঢেলে সাজায়।

১০.২. ক. ব্যক্তিস্বার্থ নয়; সামাজিক কল্যাণের আদর্শ

মুষ্টিমেয় মানুষের মাঝেই যেন সম্পদ আবর্তিত না হয়[৭৫] সে উদ্দেশ্যে দরিদ্র স্বল্পবিত্ত ও বিত্তহীনদের জন্য বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা এবং এভাবে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করা ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য। বর্তমান বিশ্বে এখনো ২০% মানুষের হাতে ৮০% সম্পদ কুক্ষিগত।[৭৬] ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিনিয়োগের প্রাক্কালে কোন শ্রেণির কোন পেশার কত মানুষের উপকার হবে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজে এবং সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মেধা, কর্মদক্ষতা কাজে লাগিয়ে তাদেরকে উৎপাদনে জড়িত করার মাধ্যমে সমাজকল্যাণ নিশ্চিত করে। তাইতো কুরআন বলে,

﴿أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾

এরাই হল সেই মানুষ যারা কল্যাণকর কাজ দ্রুত সম্পাদনা করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী।[৭৭]

১০.২. খ. সামাজিক উন্নয়নের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমন্বয়

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা শুধু একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়, ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক একটি সামাজিক আন্দোলন। এই ব্যাংক উন্নয়ন বলতে শুধু মুষ্টিমেয় মানুষের উন্নয়ন মনে করে না। শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নকেও এই ব্যাংক মানুষের প্রকৃত উন্নয়ন মনে করে না। মানুষের সার্বিক উন্নয়ন এই ব্যাংকের আদর্শ। সেই উন্নয়ন মূল্যবোধ সমন্বিত, বহুমুখী ও গতিশীল। উন্নয়নের এই সমন্বিত লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমেই একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব। ইসলামী ব্যাংকের বিবেচনায় সামাজিক উন্নয়নই হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি।

---

৭৩. আল্লাহ্ তাআলা বলেন, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "বলো আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সবই একমাত্র আল্লাহর জন্য।" আল-কুরআন, ৬ : ১৬২

৭৪. আল-কুরআন, ৫১ : ৫৬, ৬ : ১৬২

৭৫. আল্লাহ্ তাআলা বলেন, كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ "সম্পদ এমনভাবে বণ্টন করো না যেন তা শুধু ধনীদের মাঝেই আবর্তিত হয়।" আল-কুরআন, ৫৯ : ৭

৭৬. Elmelki Anas, *ibid*, pp. 126-128

৭৭. আল-কুরআন, ২৩ : ৬১

১০.২. গ. অর্থনীতিতে নৈতিক শৃঙ্খলার অনুসরণ

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় নৈতিক বিধানের সারকথা হল:

- 'সকল সম্পদের মালিক স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তা সব আল্লাহরই'।[৭৮]
- মানুষ সম্পদ ব্যয় করবে কল্যাণের জন্য। আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم﴾

হে মুমিনগণ, তোমাদের যা দিয়েছি তা থেকে দান করো।[৭৯]

﴿ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾

তোমরা ধনসম্পদ ব্যয় করবে তোমাদের পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য।[৮০]

রাসূল স. বলেন,

السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

বিধবা ও মিসকীনদের সাহায্যকারী ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারী ব্যক্তির সমমর্যাদাসম্পন্ন।[৮১]

শুধু ব্যবসার উদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। এটি একটি সামাজিক কল্যাণের মাধ্যমও বটে। সেই কল্যাণের আদর্শের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এই ব্যবস্থার লক্ষ্য। ইসলামী ব্যাংকসমূহ তার এই সামাজিক লক্ষ্য অর্জন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

১০.২. ঘ. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ইসলামী অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় থাকবে।[৮২]

ন্যায়বিচারকে ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদগণ মাকাসিদ-এর অপরিহার্য উপাদান বলেছেন। কুরআন এটিকে আল্লাহভীতির পরেই স্থান দিয়েছে[৮৩] যা রাসূলগণের প্রধান

---

৭৮. আল-কুরআন, ২ : ২৮৪, আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ

৭৯. আল-কুরআন, ২ : ২৫৪

৮০. আল-কুরআন, ২ : ২১৫

৮১. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নাফাকাত, পরিচ্ছেদ : ফযলুন নাফাকাতি আলাল আহল, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-৫০৩৮

৮২. আল-কুরআন, ৪ : ১৩৫

লক্ষ্যও ছিল।[৮৪] ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় মানুষ আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতি এই দাবীর প্রেক্ষিতে মাকাছিদের লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করে।

১০.২. ঙ. মানুষের জীবনকে ভারমুক্ত করা

নবী সা.-এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই মানবজাতিকে বোঝা ও শৃঙ্খলমুক্ত করা যা তাঁদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হতে পারে।[৮৫] শরী'আর লক্ষ্যও তাই এবং এর মাধ্যমে সমাজে কল্যাণ নিশ্চিত করা। কুরআন বলে,

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾

> তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও আর অসৎ কাজে নিষেধ কর।[৮৬]

অর্থাৎ তারা মারুফ বা কল্যাণমূলক ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করবে এবং নিজেদের জীবনকে মুনকার বা দুষ্কর্ম যা সুস্থ বিবেকবান ব্যক্তিদের কাছে অগ্রহণযোগ্য তা থেকে মুক্ত করার মাধ্যমে মানুষের জীবনকে ভারমুক্ত করবে। এই বিধানের আলোকে বিশ্ব অর্থব্যবস্থাকে মানবীয় কল্যাণাদর্শের ভিত্তিতে পুনর্গঠনের জন্য ইসলামী ব্যাংক কাজ করছে।

১০.২. চ. বিনিয়োগে অংশীদারিত্বের নীতি

বর্তমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মুশারাকা বা লাভ লোকসানে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের অংশীদারিত্ব একটি বৈপ্লবিক চিন্তা। এর ফলে ব্যাংক গ্রাহকের সাথে একাত্ম হয়ে উন্নতির জন্য চেষ্টা চালায়। গ্রাহকের ব্যর্থতা ব্যাংকের ব্যর্থতা হিসেবে গণ্য হয়। এই সম্পর্ক ইসলামী ব্যাংকিং-এর একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য।

---

৮৩. আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

"তোমরা ন্যায়ের উপর সাক্ষী হয়ে অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকো এবং কারো দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ইনসাফ থেকে বিচ্যুত হয়ো না। তোমরা ইনসাফ করো কেননা এটি আল্লাহকে ভয় করে চলার অধিক নিকটতর।" আল-কুরআন, ৫ : ৮

৮৪. আল্লাহ্ তাআলা বলেন, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

"আমি রাসূলগণকে কিতাবসহ পাঠিয়েছি এইজন্য যে তারা যেন ইনসাফের উপর কায়েম থাকতে পারে।" আল-কুরআন, ৫৭ : ২৫

৮৫. আল্লাহ্ তাআলা বলেন, يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

(যারা এই বার্তাবাহক রাসূলের অনুসরণ করে চলে...., তারা দেখতে পায় ....) তিনি তাদের ভালো কাজের আদেশ দেন, খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখেন, তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল ঘোষণা করেন, হারামবস্তুসমূহ নিষিদ্ধ করেন আর তাদের ঘাড় থেকে নামিয়ে দেন মানুষের গোলামীর বোঝা এবং সে সব বন্ধনও যা তাদের গলায় ছিল। আল-কুরআন, ৭ : ১৫৭

৮৬. আল-কুরআন, ৩ : ১১০

১০.২. ছ. টাকার কারবার নয়; পণ্যের ব্যবসা

মুরাবাহা, বাই মুয়াজ্জাল, বাই সালাম, ইজারা, ভাড়ায় ক্রয় ইত্যাদি পদ্ধতিতে ব্যাংক সরাসরি কাউকে টাকা লগ্নি করে না। অর্থের নিজস্ব কোন অর্থমূল্য নেই। আবার অর্থের নিজস্ব কোন উৎপাদন ক্ষমতাও নেই। তাই অর্থ কোন পণ্য হতে পারে না। সুদী ব্যাংকে অর্থকেই পণ্যের মতো যে কেনাবেচা হয়; সক্রেটিস-এর মতে সেটি "জালিয়াতি"। আর কার্ল মার্কস-এর ভাষায় এ ধরনের ব্যাংকিং হল ডাকাত, সিঁদেল চোর, বিকট শয়তান। এই ধরনের চৌর্যবৃত্তির মূলোৎপাটনের জন্য ইসলামী ব্যাংক এক আপোষহীন যুদ্ধে লিপ্ত।[৮৭]

১০.২. জ. মূল্যস্ফীতির কারণ দূর করা

যে তিনটি কারণে মূল্যস্ফীতি দেখা দিতে পারে-[৮৮]

১. অর্থের ক্রমবৃদ্ধির সাথে উৎপাদন প্রবৃদ্ধির অসামঞ্জস্য;
২. অনুৎপাদনশীল ও অপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় বৃদ্ধি;
৩. সরকারী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি;

অর্থের মূল্যমান স্থিতিশীল রাখা ইসলামী অর্থনীতির একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। সুদভিত্তিক ব্যবস্থায় পণ্যের সাথে টাকার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকায় অনৈতিক কার্যক্রম ছাড়াই একটি নির্দিষ্ট হারে মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ঘটতে পারে। ফলে মুদ্রার সামগ্রিক সোপান বেড়ে গিয়ে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়। সুদভিত্তিক অর্থলগ্নির ফলে বাজারে অর্থের সরবরাহ বেড়ে যায়। সেই অর্থ উৎপাদনে ব্যবহৃত না হলে মূল্যস্ফীতি দেখা দিতে বাধ্য। ইসলামী ব্যাংকসমূহ অর্থের লগ্নি করে না। পণ্যের কেনাবেচাই এর ভিত্তি। উৎপাদনের সাথে এ পণ্য প্রত্যক্ষ্যভাবে যুক্ত। তাই নির্ধারিত খাতের বাইরে অর্থ সরিয়ে নেয়া সম্ভব হয় না। এর ফলে ঋণ প্রদান উৎপাদনমূলক শ্রমের সাথে যুক্ত, সামাজিকভাবে লাভজনক ও বৈধ খাতে বিনিয়োগ প্রদানের কারণে মানুষের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এই নীতি মূল্যস্ফীতির সব কারণ দূর করতে সহায়তা করে। ইসলামী ব্যাংকিং সামাজিক দায়িত্ব পালনে মানুষদেরকে উৎসাহিত করে। সমাজের অবৈধ আয়কে নিরুৎসাহিত করে। সম্পদের সুবিচারমূলক বণ্টন ও ন্যায়নিষ্ঠ লেনদেনের সুযোগ প্রসারিত করে। ফলে সম্পদের অপরিমিত ব্যবহার ও অপচয় নিরুৎসাহিত হয়। তাই সরকারী ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনও কমে আসে।

১০.২. ঝ. বেকারত্ব দূরীকরণ ও অধিক কর্মসংস্থান

সুদ কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত করায় সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সমতা রাখতে ব্যর্থ হয়। ইসলামী ব্যাংকিং সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের সাথে যুক্ত হওয়ায় তা

---

৮৭. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২
৮৮. প্রাগুক্ত

কর্মসংস্থানের পথ প্রশস্ত করে। শুধু সম্পদশালী লোকদের মাঝে বিনিয়োগ সীমাবদ্ধ না রেখে তা স্বল্পবিত্ত ও বিত্তহীন লোকদের কর্মসংস্থানে উদ্যোগ নেয়ার কারণে বেকারত্ব দূরীকরণে ভূমিকা রাখে।

১০.২. ঞ. সম্পদ সৃষ্টি ও বন্টনে জনকল্যাণের আদর্শ

ইসলাম অর্থের মজুদ বৃদ্ধি নিরুৎসাহিত করছে; কিন্তু সঞ্চয় সৃষ্টি করে তা উৎপাদনশীল খাতে ব্যয়কে উৎসাহিত করেছে। তাই ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা জাতির প্রতিটি সদস্যকে সঞ্চয়ের কাজে অভ্যস্ত করে তা বিনিয়োগের পাশাপাশি সুষ্ঠু বন্টন নিশ্চিত করে। ফলে ইসলামের দাবি পূরণে সামর্থ্যবান লোকদের সংখ্যা বেড়ে যাবার পাশাপাশি সমাজের অর্থনৈতিক ভারসাম্যকে ধরে রাখে। সম্পদ দান মানুষকে পরিশুদ্ধ করে।[৮৯]

১০.২. চ. গ্রাহকদের সাথে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক

সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থায় সঞ্চয়কারী, ব্যাংকার ও ঋণগ্রহীতার সম্পর্ক সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক। ঋণগ্রহীতার ব্যবসায়িক লাভ ক্ষতি যাই হোক না কেন, সুদের হার পূর্বনির্ধারিত। তার লাভ ক্ষতির সাথে ব্যাংকের স্বার্থ জড়িত নয়। এই কারণে মানুষের মাঝে একাত্মতা গড়ে ওঠার সুযোগ থাকে না। ইসলামী ব্যাংকিং-এ সঞ্চয়কারীদের লাভ-লোকসানে ব্যাংক সরাসরি অংশীদার। ব্যাংক লাভের পাশাপাশি লোকসানও বহন করে। ফলে সকল পক্ষ তাদের অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা, দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে সম্মিলিতভাবে কাজে লাগায় বিধায় সকলের মাঝে একাত্মতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

১০.৩ শরী'আর নীতি অনুসরণ

ইসলামী ব্যাংক শরী'আর দৃষ্টিতে বৈধ লেনদেনেই কেবল অংশগ্রহণ করে। মুনাফা নয়, সামাজিক লাভের বিষয়টি অগ্রাধিকার দেয়। আর্থিকভাবে লাভজনক কোন ব্যবসা সামাজিক বিবেচনায় অকল্যাণকর হলে ইসলামী ব্যাংক তাতে অংশগ্রহণ করে না। শরী'আর আল-ওয়াদীয়া[৯০] নীতির ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকে চলতি হিসাব

---

৮৯. আল্লাহ্ তাআলা বলেন, الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى "যে আত্মশুদ্ধি করার জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করে"। আল-কুরআন, ৯২ : ১৮

৯০. আল-ওয়াদীয়া শব্দের অর্থ সংরক্ষণ করা, জমা করা, বাদ দেয়া ইত্যাদি। আল-ওয়াদীয়া চুক্তিতে দুটি পক্ষ থাকে। জমা গ্রহণকারী পক্ষকে বলা হয় মুয়াদ্দা ইলাইহি আর জমাকারীকে বলা হয় মুয়াদ্দি। যে বস্তু জমা রাখা হয় তার নাম মুয়াদ্দা। ইসলামী ব্যাংকিং-এ চলতি হিসাবের বিকল্প আল-ওয়াদীয়া নীতি অনুসরণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে ব্যাংক (মুয়াদ্দা ইলাইহি) জমাকারীর (মুয়াদ্দি) অর্থ (মুয়াদ্দা) জমা নেয়। জমাকারী ব্যাংককে এই অর্থ ব্যবহারের অনুমতি দেয়। এর দ্বারা জমাকারী ব্যাংকের সাথে কোন ব্যবসায়ে অংশ নেন না, ব্যাংকের ব্যবসায় কোন ঝুঁকিও বহন করেণ না।

পরিচালিত হয়। জমা গ্রহণ করে মুদারাবা[১১] ভিত্তিতে। বিনিয়োগ কার্যক্রমে শেয়ার, ক্রয়-বিক্রয় ও ইজারা[১২] এই তিনটি মূলনীতির আলোকে মুশারাকা[১৩], মুরাবাহা[১৪], বাই মুয়াজ্জাল[১৫], বাই সালাম[১৬], বাই ইসতিসনা[১৭] ইত্যাদি নীতি অনুসরণ করে। শরী'আহ কাউন্সিল এই কার্যক্রম তদারকি করে।

---

[১১] আরবী শব্দ 'দারব' অর্থ ভ্রমণ করা। মুদারাবা অর্থ ব্যবসার জন্য ভ্রমণ করা। মুদারাবা কারবারে দুটি পক্ষ থাকে। একপক্ষ মূলধন সরবরাহ করে যাকে বলা হয় সাহিবুল মাল। অপরপক্ষ সময়, শ্রম, দক্ষতা কাজে লাগায় যাকে বলা হয় মুদারিব। ব্যবসায় লাভ হলে উভয়পক্ষ চুক্তি অনুসারে লাভের ভাগী হন। লোকসান হলে সাহিবুল মাল ক্ষতি বহন করেন। তবে দায়িত্বে অবহেলা বা বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে মুদারিব লোকসান বহন করবেন।

[১২] আরবী আজ্‌র এবং উজরাত শব্দ হতে ইজারা পরিভাষাটি উদ্ভূত। আজর অর্থ প্রতিদান, মজুরী বা ভাড়া। ইজারা হলো কোন সম্পদ ব্যবহরের বিনিময় মূল্য বা লাভ বা সেবার ভাড়া। ভাড়াদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে ইজারা চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে ভাড়া গ্রহীতা ভাড়াদাতাকে নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে সম্পদ ব্যবহারের সুবিধা গ্রহণ করেন।

[১৩] মুশারাকা শব্দটি আরবী শিরকাত বা শারিকাহ শব্দ থেকে উদ্ভূত যার অর্থ অংশীদারিত্ব। মুশারাকা হলো দুই পক্ষের মধ্যে এক ধরনের অংশীদারিত্বের চুক্তি। এতে দুই পক্ষই মূলধন গঠনে অংশ নেয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মুনাফা বণ্টন হয়। লোকসান হলে ব্যাংক-গ্রাহক উভয়পক্ষই মূলধনের আনুপাতিক হারে লোকসান বহণ করেন।

[১৪] আরবী শব্দ রিবহুন থেকে মুরাবাহা শব্দ উদ্ভূত যার অর্থ মুনাফা বা লাভ। অর্থাৎ বাই মুরাবাহা হলো লাভে বিক্রয়। ব্যাংকিং ব্যবসায় মুরাবাহা এমন এক ধরনের চুক্তি যার অধীনে ব্যাংক তার গ্রাহকের অনুরোধে নির্ধারিত মাল কিনে ক্রয় মূল্যের সাথে সম্মত লাভ যোগ করে তা সেই গ্রাহকের কাছে বিক্রি করে।

[১৫] আরবী বাই ও আজল শব্দ থেকে বাই মুয়াজ্জাল পরিভাষাটি উদ্ভূত। বাই অর্থ ক্রয় বিক্রয় আর আজল অর্থ নির্ধারিত সময়। অর্থাৎ বাই মুয়াজ্জাল অর্থ ভবিষ্যতে পরিশোধের শর্তে পণ্য বিক্রয়। এটি বাকীতে পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি। ব্যাংক পণ্য কিনে তার উপর মালিকানা নিশ্চিত করার পর চুক্তির শর্ত অনুযায়ী গ্রাহককে সম্মত মূল্যে সেই পণ্য সরবরাহ করে। চুক্তিতে পণ্যের ধরন, পরিমাণ, মান, বিক্রয়মূল্য, সরবরাহের স্থান, সময়, দাম পরিশোধের সময়সীমা ও পদ্ধতি উল্লেখ থাকে।

[১৬] আরবী বাই এবং সালাম শব্দদ্বয় হতে বাই সালাম শব্দ উদ্ভূত। বাই অর্থ ক্রয় বিক্রয় আর সালাম অর্থ আগাম। সুতরাং বাই সালাম হলো আগাম ক্রয় বিক্রয়। বাই সালাম এমন এক ব্যবসায়িক চুক্তি যার আওতায় ভবিষ্যতের কোন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য সরবরাহের শর্তে ব্যাংক মালের দাম আগাম পরিশোধ করে।

[১৭] বাই ইসতিসনা হলো ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে এমন একটি চুক্তি যেখানে ক্রেতার নির্দেশে বিক্রেতা কোন বস্তু তৈরি করে দেবার অঙ্গীকার করেন। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তার চাহিদামত কোন বস্তু নির্ধারিত দামের বিনিময়ে তৈরি করে দিতে কোন কারিগর বা কারখানা মালিকের নিকট প্রস্তাব করলে এবং মালিক ঐ প্রস্তাবে রাজী হলে ইসতিসনা চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ ক্ষেত্রে আদেশদাতাকে বলা হয় 'মুসতাসনি' আর আদেশগ্রহীতাকে বলা হয় 'সানে'। আদেশের ফলে তৈরি করা পণ্যের নাম মাসনূ।

১১. ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানসমূহ কীভাবে সমাজকল্যাণের উপাদানসমূহ কাজে লাগায় ?

ইসলাম এমন একটি জীবন ব্যবস্থা যেখানে মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা রয়েছে। আর এই নির্দেশনা অনুসারে মানুষের সকল কাজেরই লক্ষ্য হয়ে থাকে কল্যাণ অর্জন। আরবী ফালাহ্ শব্দের অর্থ কল্যাণ, মঙ্গল, উন্নয়ন, সুখ, সফলতা, বৃদ্ধি ইত্যাদি। আর ফালাহ্ অর্জনের জন্য প্রয়োগ করতে হয় শরী'আর নিয়মনীতি যার মূল উৎস কুরআন। মানুষ ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিকভাবে কীভাবে এই কল্যাণের জন্য কাজ করবে- শরী'আহ্ ঠিক তাই বলে দেয়। সামাজিক দায়বদ্ধতা এই শরী'আর উদ্দেশ্য হাসিল থেকেই উদ্ভূত। এই শরী'আর কারণেই সকল কাজের নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক দায়িত্বানুভূতি মাথায় নিয়েই ইসলামী ব্যাংকসমূহকে তার দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালিত করতে হয় আর নিশ্চিত করতে হয় ব্যাংকের ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নৈতিক আর মানবিক হয় কি না। এভাবেই কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব পালন ইসলামী ব্যাংকের একটি অঙ্গীকারে পরিণত হয়। ইসলামী ব্যাংক দুটি মূলনীতির মাধ্যমে সমাজকল্যাণে নিজের ভূমিকা পালন করে থাকে-

অ. মাসলাহা (জনস্বার্থ ও কল্যাণ)

আ. কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা

মাসলাহাকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা হয় :

ক) জরূরিয়্যাত বা অতি প্রয়োজনীয়;

খ) হাজিয়্যাত বা প্রয়োজনীয়;

গ) তাহ্সীনিয়্যাত বা সৌন্দর্যবর্ধক।
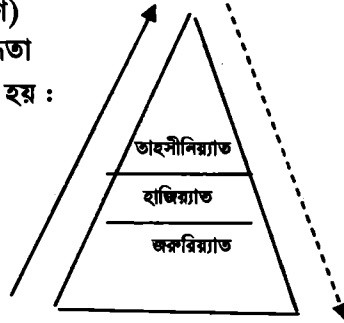
চিত্র ৩ : মাসালিহ্ পিরামিড

ইসলামী ব্যাংকসমূহ অর্থ ব্যয়/বিনিয়োগ/ কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা পরিপালনে মাছালিহ্ পিরামিড অনুসরণ করে। অর্থ্যাৎ কোন প্রয়োজন আগে পূরণ করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নেবার সময় প্রথমে জরূরিয়্যাত (আকীদা-বিশ্বাস, জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি, বংশধর ও সম্পদের সংরক্ষণ), অতঃপর হাজিয়্যাত, তারপর তাহ্সীনিয়্যাতকে পর্যালোচনা করে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সামাজিক দায়বদ্ধতাকে দুইভাবে পরিপালন করা হয়:[৯৮]

ক) গ্রহণযোগ্য দিকগুলো স্টেকহোল্ডারদের মাঝে প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ;

খ) বর্জনীয় দিকগুলো সতর্কতার সাথে পরিহার ও এড়িয়ে চলা।

---

৯৮. Muhammed Yasir Yusuf and Zakaria Bin Bahari, *ibid*, pp. 12-15

মাসলাহার মূলনীতি অনুসারে ইসলামী ব্যাংকসমূহ কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতাকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করে[৯৯] :

জরূরিয়্যাত-এর প্রয়োজন পূরণে ইসলামী ব্যাংকসমূহের করণীয় হল বেতন ভাতাদি নিয়মিত পরিশোধ করা, অফিসে পর্যাপ্ত নামাজের জায়গা রাখা, তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, বিনিয়োগে অগ্রাধিকারের ক্রম তৈরি করা, কোথায় কতটুকু বিনিয়োগ করলে কোন গ্রুপের কত লোক উপকারভোগী হবে, পরিবেশ ও সমাজের উপর তার কী প্রভাব পড়বে এবং সেই বিনিয়োগ শরীয়াসম্মত কি না ইত্যাদি বিবেচনা করা। এর ফলে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠনে ইসলামী ব্যাংক ভূমিকা রাখে। জরূরিয়্যাত-এর প্রয়োজন পূরণের পরেই কেবল হাজিয়্যাত বা সাধারণ প্রয়োজন পূরণ করা যাবে। যেমনঃ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি, ট্রান্সফার, পোস্টিং, বেতন ভাতায় ন্যায়বিচার করা, নিরাপদ কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি, ট্রেনিং প্রোগ্রামের আয়োজন ইত্যাদি। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের পরেই কেবল অন্যান্য খাতে বিনিয়োগ করবে। আর হাজিয়্যাতের প্রয়োজন পূরণ নিশ্চিত হবার পরে তাহসীনিয়্যাত বা সৌন্দর্যবর্ধক দ্রব্য যেমন স্বর্ণ, হীরক, বিলাসবহুল গাড়ি ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ করবে।

ইসলামী ব্যাংকসমূহের অন্যান্য সমাজকল্যাণমূলক কাজ[১০০]

গ্রুপভিত্তিক বীমা ও বিনিয়োগ, পারিবারিক বিনিয়োগ প্রোগ্রাম, পরিবেশ বান্ধব ব্যাংকিং প্রোগ্রাম, ওয়েলফেয়ার ফান্ড, ক্যাশ ওয়াক্ফ, যাকাত ফান্ড, লকার সার্ভিস, বই, বুকলেট, জার্নাল প্রকাশ, ডিভিডেন্ড পেমেন্ট, ইলেকট্রিক/গ্যাস/পানি বিল গ্রহণ, র‍্যালি, সেমিনার, শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, খেলাধুলা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি প্রোগ্রামের আয়োজন, রিলিফ প্রোগ্রাম, কর্যে হাসান ইত্যাদি। তাছাড়া দক্ষিণ এশিয়ায় ব্যাংক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে হাঁস মুরগী পালন, সেলাই প্রশিক্ষণ, রিক্সা প্রকল্প ইত্যাদি আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম, টোকাই, কুলি, মজুরদের জন্য স্কীম, মডেল মাদ্‌রাসা, এককালীন সহায়তা, বস্তিবাসী শিশু ও বয়স্কদের শিক্ষা কার্যক্রম, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম, স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, মেডিকেল কলেজ, হসপিটাল প্রতিষ্ঠা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, সাহিত্য ও সাময়িকী প্রকাশনা, মহিলা মাদ্‌রাসা শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প, মহিলা পুনর্বাসন

---

৯৯. Dasuki, Asyraf Wajdi dan Irwany,. "Maqasid as Shariah, Significance and Corporate Social Responsibility". *The American Journal of Islamic Social Science*, 2007, 24 : 1, pp.34-36

১০০. N Mashhour,. *Social and Soliderity Activity in Islamic Banks*,. International Institute of Islamic Thoughts, 1996. pp 20-22.

প্রকল্প, বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প, দাতব্য চিকিৎসালয়, চক্ষু চিকিৎসা প্রকল্প, ঠোঁট কাটাদের জন্য অপারেশন ক্যাম্প, ধাত্রী বিদ্যা প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ইত্যাদি সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

১২. কল্যাণের লক্ষ্য অর্জনে ইসলামী ব্যাংকিং

একটি পূর্ণাঙ্গ ও গতিশীল জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের ব্যাপ্তি জীবনের সকল বিভাগকে স্পর্শ করে এবং জীবনের একটি ব্যাপক তাৎপর্য বহন করে। এ অবস্থান থেকে ইসলামী ব্যাংকিং ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কাজ করে।

১২. ক) বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব

রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

الْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِه

সকল সৃষ্টিই হল আল্লাহর পরিবার (স্বরূপ)। অতএব, আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় সৃষ্টি হল, যে তাঁর পরিবারের সাথে সদ্ব্যবহার করে।[১০১]

ইসলামী ব্যাংকসমূহ ভ্রাতৃত্বের এই ধারণাগত কাঠামোর আওতায় সম্পদ আবর্তনের অন্যতম অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

১২. খ) সম্পদ একটি আমানত

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পদের মালিক আল্লাহ তা'আলা।[১০২] মানুষ তার প্রতিনিধি[১০৩] হিসেবে এই সম্পত্তির আমানতদার মাত্র।[১০৪] এই আমানতদারীর অর্থ হল প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ তাঁর আওতাধীন সকল উপায় উপকরণ আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মে ব্যয় করবে। সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের জন্য নয় বরং সকলের উপকারের জন্য[১০৫] এবং তা বৈধভাবেই উপার্জন করতে হবে।[১০৬] আর বৈধভাবে অর্জিত হলেও তা আমানতের শর্তের বাইরে ব্যয় করা যাবে না। আর এ আমানতদারিতা শুধু ব্যক্তির কল্যাণ নয়, গোটা সমাজেরই কল্যাণ। ইসলামী ব্যাংক এই গোটা সমাজের কল্যাণকে সামনে রেখেই তার সকল কার্যক্রমকে পরিচালিত করে।

---

১০১. ইমাম আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত, প্রাগুক্ত,* হাদীস নং-৫৫৪১; হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফ ওয়াল মাওযূআহ ওয়া আছারুহাস সায়্যি ফিল উম্মাহ,* প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৯০০

১০২. আল-কুরআন, ৫৭ : ১০

১০৩. আল-কুরআন, ২ : ৩০

১০৪. আল-কুরআন, ৫৭ : ০৭

১০৫. আল্লাহ্ তাআলা বলেন, هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً "তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি এই পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের সকলের ব্যবহারের জন্যই তৈরী করেছেন"। আল-কুরআন ২ : ২৯

১০৬. আল্লাহ্ তাআলা বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً "হে মানুষ তোমরা জমীনে যা কিছু হালাল ও পবিত্র আছে তা থেকেই খাও"। আল-কুরআন, ২ : ১৬৮

১২. গ) সরল ও বিনীত জীবন যাপন

খিলাফতের গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হবে বিনীত।[১০৭] ঔদ্ধত্য, জাঁকজমক, আড়ম্বর জীবন অপব্যয় ও অপচয়ের কারণ হয়।[১০৮] ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা তার স্টেকহোল্ডারদেরকে এই নীতির আলোকে অভ্যস্ত করে তোলে।

১২. ঘ) মানুষের স্বাধীনতা

মানুষের স্বাধীনতা নিরংকুশ, একচ্ছত্র বা অবাধ নয়। শরী'আর বিধিবদ্ধ নিয়মের মধ্য থেকে একজন মানুষ তাঁর অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণে উপায় খুঁজে পায়। এ ক্ষেত্রে সে স্বাধীন। শরী'আর লক্ষ্য হল প্রত্যেককেই সুশৃঙ্খল জীবনের অধীন করে সকলের কল্যাণ নিশ্চিত করা।[১০৯] এভাবেই জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টি হতে পারে।

১২. ঙ) চাহিদা পূরণ

সম্পদ যাতে প্রত্যেকের চাহিদাই পূরণে অবদান রাখতে পারে সে লক্ষ্যে সম্পদের বণ্টন ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ইসলামী ব্যাংকসমূহ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইসলামী ব্যাংকিং যে কোন চাহিদাকে "চাহিদা" বলে স্বীকৃতি দেয় না। ইসলামে মদ, গাঁজা, আফিম, তামাক ইত্যাদি উৎপাদন নিষিদ্ধ। এগুলো যতোই লাভজনক হোক না কেন, ইসলামের দৃষ্টিতে চাহিদা নয় বিধায় ইসলামী ব্যাংকসমূহ এসব খাতে বিনিয়োগ করে না।

১২. চ) আয় ও সম্পদের ইনসাফভিত্তিক বণ্টন

অর্থনীতিকে তার সামগ্রিক অবস্থার আলোকে বিশ্লেষণ করলে শুধুমাত্র উচ্চতর প্রবৃদ্ধি এবং উৎপাদনের দিকে দৃষ্টিপাত করাই কাম্য নয়; বরং তার সুষম বণ্টন ব্যবস্থাও অত্যন্ত জরুরী। এ বণ্টন ব্যবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

ধনীদের সম্পদে রয়েছে বঞ্চিত ও গরীবের অধিকার।[১১০]

সম্পদ কতটুকু উৎপাদিত হল সেটিই শেষ কথা নয়, সেই সম্পদ কীভাবে কার মাঝে কতটুকু বণ্টন হল সেটির প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয় ইসলামী ব্যাংকিং।

---

১০৭. আল্লাহ্ তাআলা বলেন, وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ "তোমরা কোন অবস্থাতেই অপচয় করবে না। আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না"। আল-কুরআন, ৭ : ৩১
وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ "তোমরা অপব্যয় করবে না কারণ অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই"। আল-কুরআন, ১৭ : ২৬-২৭

১০৮. আল্লাহ্ তাআলা বলেন, وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا; "তোমরা যখন ব্যয় করবে অপব্যয় করবে না আবার কার্পণ্যও করবে না"। আল-কুরআন, ২৫ : ৬৭

১০৯. আল্লাহ্ তাআলা বলেন, وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ "আসমান সমূহ ও জমীনের মালিকানা স্বয়ং আল্লাহর"। আল-কুরআন, ৫৭ : ১০

১১০. আল-কুরআন, ৫১ : ১৯

আমেরিকার অর্থনীতিবিদ উইলিয়াম ডোমহফ-এর প্রকাশিত গবেষণা মতে, উচ্চবিত্ত ১% মানুষের হাতে আমেরিকার সম্পত্তির ৪২% কেন্দ্রীভূত। উচ্চবিত্তদের পরবর্তী ১৯% ব্যক্তির হাতে ৫৩.৫% সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত। অর্থাৎ ২০% ব্যক্তির হাতে আমেরিকার ৮৯% সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত। বাকী ১৫% সম্পত্তির মালিকানা ৮০% ব্যক্তির মধ্যে ঘোরাফেরা করে।[১১১] মধ্যম ও দরিদ্র সারির দেশগুলোর চিত্র এর চেয়েও ভয়াবহ। বাংলাদেশের ৮০% মানুষ গড়ে মাথাপিছু ১১৪০ ডলারের কম উপার্জন করে। মাত্র ৭% ব্যক্তি জিডিপির ২৭% ভোগ করে।[১১২]

ইসলামী অর্থনীতির নৈতিক শৃঙ্খলা বা ফিল্টার মেকানিজম-এর বিধান সম্পদে হালাল-হারামের সীমা নির্ধারণ এবং অপচয় ও অপব্যয় রোধের মাধ্যমে মানুষের অসীম চাহিদার ধারণাকে পাল্টে দেয়। খালীফা ওমর ইবনু 'আবদিল আযীয রা.-এর শাসনামলে উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধির হার খুব বেশি না হলেও যাকাত নেয়ার লোক পাওয়া যায়নি। এর মূলে ছিল অর্থ সম্পদের ইনসাফভিত্তিক বন্টন ও বিতরণ। ইসলাম একচেটিয়া কর্তৃত্ব ও সম্পদ জমা রাখার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং সম্পদ বন্টন ও বিকেন্দ্রীকরণে যাকাত, উশর, সাদাকা, কাফফারা, ওয়াকফ্‌সহ বিভিন্ন ট্রান্সফার, পেমেন্ট ও অন্যান্য আর্থিক কার্যক্রমের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে। সুদের বিলোপ শুধু আর্থিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের ইঙ্গিতই বহন করে না, বরং সামগ্রিক ইসলামী আদর্শের ছাঁচে পুনর্গঠন করে। ইসলামী ব্যাংকিং-এ যাকাত ও অন্যান্য ট্রান্সফার পেমেন্টের মাধ্যমে সম্পদের ইনসাফভিত্তিক বন্টনের ব্যবস্থা করেছে যা এক কথায় অনন্য। ইসলামী ব্যাংকিং হল বিশ্ববাসীর জন্য ইসলামের কল্যাণের মাঝে প্রবেশ করার একটি দরজা বা মঞ্চ।

১৩. ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রতি আস্থা বৃদ্ধি

ইসলামী ব্যাংকিং-এর কার্যক্রম পরিচালিত হয় বিশ্বাস আর বিবেকের বোধ থেকে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা তাত্ত্বিক যুদ্ধে জয়ী হয়েছে। এখন অপেক্ষা শুধু পরিচালনাগত যুদ্ধে জয়ী হওয়া।[১১৩] গত তিন দশকে বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রতি মুসলিমদের পাশাপাশি অমুসলিমদের আস্থা বৃদ্ধি ও ঈর্ষান্বিত প্রবৃদ্ধি এই ব্যাংকিংকে একটি সুদৃঢ় অবস্থানে নিয়ে গেছে। প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবসায় যে হারে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকিং তার চেয়ে ৫০ শতাংশ অধিকহারে প্রবৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৩ সালের শেষে বিশ্ব ইসলামী অর্থনীতির অংশ দাঁড়াচ্ছে ১.৩ ট্রিলিয়ন পাউন্ড। পাশ্চাত্যে ব্রিটেন হতে যাচ্ছে প্রথম দেশ, যেখানে ইসলামী বন্ড 'সুকূক' চালু হচ্ছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে

---

১১১. http://www2.ucsc.edu/whorulesamerica/power/wealth.html

১১২. http://www.unicef.org/infobycountry/bangladesh_bangladesh_statistics.html

১১৩. প্রফেসর ড: এম এন হুদা, দৈনিক ইত্তেফাক ১২ আগস্ট ১৯৮৩,

ইসলামী ব্যাংকিং এর অংশ মাত্র ১% হলেও এর প্রবৃদ্ধির হার গড়ে ১৫-২০% যা বিশ্ব অর্থনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নুতন করে ভাবতে বাধ্য করেছে।[১১৪]

২০০৭-০৮ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার মূল কারণ ছিল ব্যাংকের অনৈতিক কার্যক্রম। অর্থাৎ এত বড় দুর্ঘটনার জন্য প্রচলিত ব্যাংকিং সিস্টেমই ছিল দায়ী। এর সমাধানও ব্যাংকিং এর মধ্যেই। সেই মন্দায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি ইসলামী ব্যাংকগুলো। ইসলামী ব্যাংকিং বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এর প্রমাণ বিশ্বব্যাপী পরিচিত সিটিগ্রুপ, জেপি মরগ্যান, বারক্লেস, ক্লিনোর্ট বেনসন, ডয়েস ব্যাংক, লয়েডস, এবিএন আমরো, রয়্যাল ব্যাংক অব স্কটল্যান্ড, গোল্ডম্যান সাস, অ্যামেরিকান এক্সপ্রেস, গ্রিন্ডলেস, কমার্স ব্যাংক, সোসাইটি জেনারেল, এইচএসবিসি, বিএনপি পারিবাস সহ আরো অনেক বড় বড় ব্যাংক ইতোমধ্যেই ইসলামী ব্যাংকিং চালু করেছে।[১১৫]

বিগত তিন দশকে প্রায় ১৮০ টি ইসলামী ব্যাংক পরিপূর্ণভাবে এবং প্রায় ৩০০ ব্যাংকের ৮০০০ শাখায় ইসলামী ব্যাংকিং চালু হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রবৃদ্ধি গত এক দশক ধরে ১৫-২০% যার সম্পদ প্রায় ৩ ট্রিলিয়ন ডলার যা মোট ব্যাংকিং এসেটের প্রায় ৫%।[১১৬] বর্তমানে বিশ্বে ৫১ টি দেশে ৩০০ টি ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। বৃটিশ পত্রিকা ডেইলি মেইল ইসলামী ব্যাংকিংকে সকল গ্রাহকদের জন্যই "নিরাপদ জান্নাত" অভিহিত করেছে[১১৭] এবং ইসলামী ব্যাংকিংকে সেরাদের সেরা বলেছেন। ইসলামী ব্যাংকিং এখন সারা বিশ্বের মডেল।[১১৮]

---

[১১৪]. বিগত ২৯ অক্টোবর ২০১৩ লন্ডনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের সম্মেলনে ভাষণ প্রদানকালে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন এই তথ্য প্রদান করেন (সূত্রঃ ফিন্যান্সিয়াল টাইমস, ৩০ অক্টোবর ২০১৩)

[১১৫]. Ahsanul Haque et al; "Factor Influences Selection of Islamic Banking" *The American Journal of Applied Science* 6(5): 2009. pp. 924-928

[১১৬]. http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/World_Islamic_Banking_Competitiveness_Report_2013

[১১৭]. http://www.dailymail.co.uk/news/article-1070430/Non-Muslims-flock-safe-haven-Sharia-bank-protected-crunch-non-gambling-rule.html

[১১৮]. http://www.academia.edu/4004426/Islamic_Banking_Business_Model_for_Micro_Finance
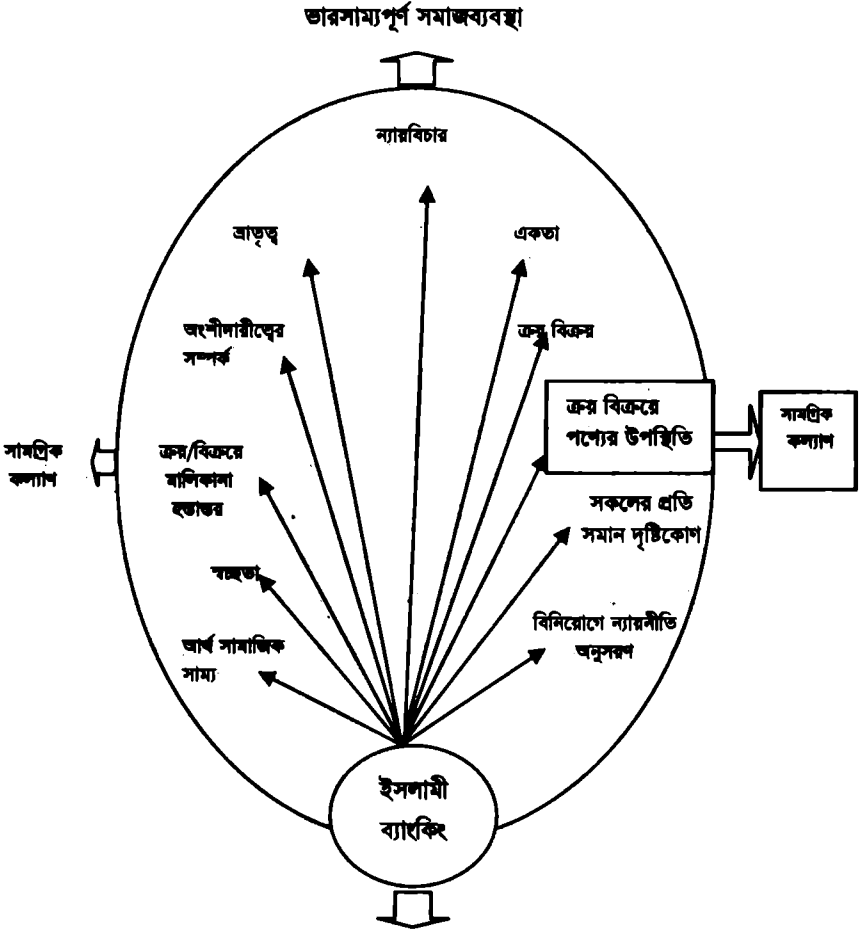
চিত্র ৪ : ইসলামী ব্যাংকিং এ সমাজকল্যাণ

১৪. বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার সফলতা

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ইতোমধ্যে অবস্থান সুদৃঢ় করেছে। জনগণের বিপুল আগ্রহ ও সমর্থনে বিকশিত হয়ে ইসলামী ব্যাংকগুলো বিগত বছরগুলোতে আমানত সংগ্রহ, বিনিয়োগ, আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য, রেমিটেন্স আহরণ এবং পরিচালনাগত মুনাফা অর্জনে প্রচলিত ধারার তুলনায় বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। বর্তমানে দেশের মোট ৭ টি ইসলামী ব্যাংক পূর্ণাঙ্গভাবে এবং ৯ টি ব্যাংকের ২০ টি শাখায় ইসলামী ব্যাংকিং চালু করেছে এবং দুটি সুদভিত্তিক ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং চালুর প্রক্রিয়ায় রয়েছে।[১১৯]

দুই যুগের মধ্যে দেশের মোট জমা ও বিনিয়োগের এক ষষ্ঠাংশ ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির আওতায় এসেছে। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এখন আর তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয় নয়। মুদারাবা, মুশারাকা, বাই মুয়াজ্জাল, বাই সালাম প্রভৃতি পরিভাষা এখন দেশের বিরাট জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন বাস্তব আর্থিক লেনদেনের ভাষা হিসেবে চালু হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিং দেশের সকল স্তরের জনগণের মাঝে আস্থা ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কোন নৈতিক ও কাঠামোগত বাধ্যবাধকতা নেই। বিগত এক দশকে এদেশের ব্যাংকিং খাতে যতোগুলো কেলেংকারি সংগঠিত হয়েছে তার মধ্যে ইসলামী ব্যাংকগুলোর নাম নেই।

১৫. বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রসারে কিছু সুপারিশ :

১৫.১ পূর্ণাঙ্গ ইসলামী অর্থবাজার চালু করা জরুরী। Government Islamic Investment Bond (GIIB), Islamic Mutual Fund (IMF) সীমিত আকারে চালু হলেও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী অর্থবাজার চালু হলে আরো বেশি সংখ্যক সুদভিত্তিক ব্যাংক দ্রুত ইসলামী ব্যাংকিং-এর আওতায় আসবে।

১৫.২ আইডিবি সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে ইসলামীকরণের প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নে সরকারের আরো জোরালো ভূমিকা পালন করা জরুরী।

১৫.৩ গ্রাহকদের মধ্য থেকে উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কোন গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ফোরাম নেই; যা চালুর উদ্যোগ নেয়া দরকার।

---

[১১৯] মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯

১৫.৪ ইসলামী ব্যাংকারদের উন্নততর প্রশিক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এদেশে নেই। এ জন্য সহযোগী কোন প্রতিষ্ঠানও গড়ে না ওঠায় একটি শূন্যতা রয়েই গেছে। এই শূন্যতা পূরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগ নেয়া জরুরী।

১৫.৫ বাংলাদেশে দ্রুত বিকাশমান ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তি সরবরাহের লক্ষ্যে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে 'ইসলামিক ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং' বিষয় এবং এর সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য কোর্সসমূহ প্রবর্তন করা দরকার।

১৫.৬ বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের শাখা সম্প্রসারিত করা দরকার।

১৫.৭ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) এর অভিন্ন ও সমন্বিত হিসাবপদ্ধতি সকল ইসলামী ব্যাংক তাদের সকল কার্যক্রমে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

১৫.৮ মুসলিম দেশ, বিশেষত যেসব মুসলিম দেশে ইসলামী ব্যাংকিং চালু হয়েছে সেসব দেশের সাথে আন্তঃবাণিজ্যে অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করে ইসলামী কমন মার্কেট গঠন করা যেতে পারে।

১৬. উপসংহার

অর্থ-সম্পদের ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন ও আর্থ-সামাজিক সুবিচার কায়েম ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য। এই লক্ষ্য নির্ধারণের মাধ্যমে অর্থনীতিতে মানবকল্যাণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে ইসলাম। নৈতিক বাধ্যবাধকতা বা শৃঙ্খলাই ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের ভিত্তি যা অন্যান্য ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুপস্থিত। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি অংশ হিসেবে ইসলামী ব্যাংক মূলত ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করে। ইসলামী ব্যাংকিং-এর উদ্দেশ্য শুধু মুনাফা অর্জন করাই নয়, বরং সাথে সাথে সমাজে অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবতার কল্যাণ।

সাধারণ জনগণের ডিপোজিট হতে গৃহীত অর্থ ইসলামী ব্যাংক বিত্তবান ও ক্ষমতাশীলদের জন্য নয়, বরং সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য সর্বোচ্চ দক্ষতার সাথে ও সুষ্ঠুভাবে ব্যয় করতে সচেষ্ট। ইসলামী ব্যাংকিং-এ আমানত ব্যবহারের সার্বিক লক্ষ্য হল- ক. সর্বাধিক শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান; খ. সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন, আমদানী ও সুষ্ঠু

বিতরণ ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ। বন্টন ও বিতরণে ন্যায়বিচারের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ভারসাম্য আনয়নের কাজটিই করে যাচ্ছে ইসলামী ব্যাংক। আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবতার কল্যাণ সাধন-এর মূল উদ্দেশ্য।

ইসলামী ব্যাংকিং তার সম্পূর্ণতা ও সম্পন্নতা নিয়ে মাত্র চার দশকের মধ্যে বিশ্ব অর্থবাজারে ইতিবাচক ও সংহত অবস্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে। আধুনিক নেতৃত্বস্থানীয় অর্থনীতিবিদদের চিন্তা ক্রমেই ইসলামী অর্থনৈতিক দর্শন, চিন্তা ও কাঠামোর নিকটবর্তী হচ্ছে। চিন্তার ক্ষেত্রে এই আলোড়ন নতুন করে এই প্রত্যয়কেই জাগ্রত করেছে যে, ইসলামী অর্থনীতিই বিদ্যমান সামাজিক কাঠামো, জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের মধ্যে কাঙ্খিত আমূল পরিবর্তন নিশ্চিত করতে সক্ষম। পাকিস্তান ও ইরান নিজ দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ইসলামী শরী'আর নীতির ভিত্তিতে পুনর্গঠন করে প্রমাণ করেছে, একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামী নীতির মাধ্যমে পরিচালনা করে জনগণের কাছে আর্থিক সুফল পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমেই মানব কল্যাণ সাধন সম্ভব।

ইসলামের মূলনীতি অনুসারে জীবনের কোন ক্ষেত্রেই মানুষ ইসলাম অনুসৃত গণ্ডী অতিক্রম করতে পারে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও নয়। ইসলামী ব্যাংকিং-এ সুদ, ঘুষ, গ্যামব্লিং, সন্দেহজনক লেনদেন, প্রতারণা ও লোভ-এর কোন স্থান নেই। এর মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে জাগ্রত হয় বিশ্বস্ততা, জবাবদিহিতা, মূল্যবোধ, অধিকার সচেতনতা, সত্যবাদিতা, ভদ্রতা, বিনয়, আমানতদারিতা, শ্রদ্ধাবোধ, প্রশস্ত হৃদয়, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, ভ্রাতৃত্ব, প্রজ্ঞা আর দায়বদ্ধতা। এই দায়বদ্ধতা বুঝতে পারা আর তার পরিপালনের মধ্যেই মূলত সামাজিক কল্যাণ। ইসলামী ব্যাংকের সকল প্রচেষ্টা মূলত এই কল্যাণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিবেদিত। এই কল্যাণ নিশ্চিতকরণ আজ শুধু অঙ্গীকারেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং বাস্তবক্ষেত্রে প্রমাণিত।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৩৯
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১৪

আল-ফিকহুল মুকারান-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (হিজরী ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত) : একটি গ্রন্থভিত্তিক সমীক্ষা

শাহাদাৎ হুসাইন খান*

[**সারসংক্ষেপ :** *আল-ফিকহুল* মুকারান *বিষয়টির উৎপত্তি মৌখিকভাবে সাহাবীগণের যুগে হলেও লিখিত আকারে এটির চর্চা শুরু হয় হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে। এর পরবর্তী সময়ে বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়ে বিকশিত হতে শুরু করে। প্রত্যেক শতাব্দীতে এ বিষয়টির ওপর একাধিক বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। মূলত এ শাস্ত্রটি এসব গ্রন্থের মাধ্যমেই বর্তমান যুগ পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাফসীর, হাদীস ও এ দুটির ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ এবং ফিকহের গ্রন্থাবলির মাধ্যমে এ বিষয়টি ব্যাপকতা ও বিকাশ লাভ করেছে। তবে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এ শাস্ত্রটির উৎপত্তি ও হিজরী ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত ক্রমবিকাশ আলোচনা করা হয়েছে। এ শাস্ত্রের প্রথম গ্রন্থ কোনটি এবং কোন শতাব্দীতে কোন গ্রন্থটি লেখা হয়েছে, সেই গ্রন্থের লেখক ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে ধারণা দেয়া হয়েছে। প্রতি শতাব্দীতে লেখা বিখ্যাত গ্রন্থগুলোকে মুখ্য গ্রন্থ ধরে এবং অন্য গ্রন্থগুলোকে গৌণ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করে প্রবন্ধটি সাজানো হয়েছে। আধুনিককালে বিষয়টি বিভিন্ন দেশে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে চর্চা হলেও বাংলাদেশে সে প্রবণতাটা কম। এ প্রবন্ধটি এ দেশে যারা তুলনামূলক ফিকহ অধ্যয়ন করেন এবং উদার মনে ফিকহ গবেষণায় সম্পৃক্ত হতে চান তাদের জন্য সহায়ক হবে।]*

উপক্রমণিকা

বর্তমান পৃথিবীর মুসলিমদের দুরাবস্থার অন্যতম কারণ হলো তাদের অনৈক্য এবং ইজতিহাদ তথা শরীয়াহ গবেষণার দরজা বন্ধ রেখে বিভিন্ন ব্যক্তিকেন্দ্রীক মাযহাব (School of thought)-এর প্রতি পক্ষপাতিত্ব। একদিকে এক মতের অনুসারীরা অন্য মতাবলম্বীদেরকে হেয়, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছেন এবং অপরদিকে মহামতি মুজতাহিদ ইমামগণের মতের মুকাল্লিদগণ তাদের অনুসরণীয় ইমামগণের মতপার্থক্যের কারণ ও দলীল না জেনে এবং সেগুলোর মধ্যে তুলনা না করেই নিজের মতকে শ্রেষ্ঠ মনে করছেন। এরূপ পরিস্থিতি বর্তমান সময়ের মুসলিমদেরকে বিভ্রান্তি তে নিমজ্জিত করছে এবং এ কারণে অনেকেই চরম সিদ্ধান্তহীনতায়ও ভুগছেন। ফলে সংকট ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। এ সংকট যেহেতু পূর্বকালেও কম-বেশি ছিল, তাই প্রাচীন কাল থেকে এ সংকট থেকে উত্তরণের পথ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল।

---

* গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা-১০০০।

প্রত্যেক যুগেই প্রখ্যাত আলিম, ইমাম, ফকীহ ও মুজতাহিদগণ ফিকহী ইমামগণের মতপার্থক্য নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এই বিভিন্ন ফিকহী মতের মধ্যকার তুলনামূলক আলোচনাই বর্তমান কালে 'আল-ফিকহুল মুকারান' নাম ধারণ করে নবরূপে ও উন্নত পদ্ধতিতে আমাদের সামনে এসেছে। মানুষের সুবিধার্থে ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই ফকীহগণ কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে বিভিন্ন মাসআলার সমাধান বলেছেন বা লিখেছেন। সেই মাসআলাগুলোর সমাধানে ফকীহগণের মাঝে মতানৈক্য দেখা দেয়ায় এর কারণ অনুসন্ধান ও সমাধান বের করে মানুষকে মতবিরোধের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে আল-ফিকহুল মুকারান-এর ভূমিকা অনন্য।

আল-ফিকহুল মুকারান পরিচিতি

ক. আল-ফিকহুল মুকারান পরিভাষাটির শাব্দিক বিশ্লেষণ

আল-ফিকহুল মুকারান (الفقه المقارن) পরিভাষাটি ফিকহ (الفقه) ও মুকারান (المقارن) শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত যৌগিক শব্দ। ফিকহ (الفقه) এর আভিধানিক অর্থ হলো কোন বিষয়ের জ্ঞান, বুঝ, অনুধাবন, উপলব্ধি, বুদ্ধি, মেধা, বিচক্ষণতা।[১] কোন বিষয়ের সূক্ষ্ম জ্ঞান অনুধাবন (إدراك دقائق الأمور)।[২] প্রাথমিক কালে ফিকহ বলতে যে কোনো বিষয়ের জ্ঞানকে বুঝালেও পরবর্তীকালে শরীআহর জ্ঞান বুঝাতে এ শব্দটির ব্যবহার সীমিত হয়ে যায়।[৩] সাধারণ দৃষ্টিতে কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত মানবজীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কিত বিষয়াবলির সুসমন্বিত বিন্যাসই হলো ফিকহ।

উসূলবিদগণের মতে ফিকহ-এর পারিভাষিক অর্থ হলো :

هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية المكتسب من ادلتها التفصيلية

শরীয়তের বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে অর্জিত শরীয়তের গৌণ (অর্থাৎ ব্যবহারিক) বিষয়াবলি সংক্রান্ত জ্ঞানকে ফিকহ বলা হয়।[৪]

---

১. মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রাজ্জাক আল-হুসাইনী, *তাজুল আরূস মী জাওয়াহিরিল কামূস*, কায়রো : দারুল হিদায়াহ, তা.বি., খ. ৩৬, পৃ. ৪৫৬; মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াকুব আল-ফিরোজাবাদী, *আল-কামূসুল মুহীত*, খ. ৭, পৃ. ৭৫

২. ড. মুহাম্মাদ রাওয়াস কালআ জী ও ড. হামীদ সাদিক কুনাইবী, *মুজামু লুগাতিল ফুকাহা*, বৈরূত : দারুন নাফায়িস, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি., পৃ. ২৬১-৬২

৩. সাদি আবূ জাইয়িব, *আল-কামূসুল ফিকহী লুগাতান ওয়া ইসতিলাহান*, দামেশক : দারুল ফিকর, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি., পৃ. ২৮৯

৪. *প্রাগুক্ত;* তাকীউদ্দিন আলী ইবনু আব্দিল কাফী আস-সুবুকী, *আল-ইবহাজ ফী শারহিল মিনহাজ*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫খ্রি., খ. ১, পৃ. ৪৬

'মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা' গ্রন্থে ফিকহ-এর সংজ্ঞায় লেখা হয়েছে,

العلم بالاحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية

শরীয়তের বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে অর্জিত শরীয়তের বিধি-বিধান সংক্রান্ত জ্ঞানকে ফিকহ বলা হয়।[৫]

আল-ফিকহুল মুকারান পরিভাষার দ্বিতীয় অংশ আল-মুকারান (المقارن) শব্দটি - قارن-يقارن-مقارنة(কারানা-ইউকারিনু-মুকারানাতান) ক্রিয়া থেকে কর্মবাচক বিশেষ্যের একবচনের শব্দ। مقارنة -এর অর্থ হলো দু'টি বিষয় বা জিনিসকে একত্র করা, মিলানো, দু'টি বিষয়ের মাঝে তুলনা করা বা দুটি বিষয় বা জিনিসকে মুখোমুখি করা। কর্মবাচক শব্দ হিসেবে مقارن (মুকারান) শব্দের অর্থ হবে তুলনা করা হয়েছে এমন, তুলনীয়, তুলনামূলক।[৬] যাকে ইংরেজিতে Comparative বলে।[৭]

উপর্যুক্ত আভিধানিক বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, যে ফিক্‌হে বিভিন্ন ফিকহ বিষয়ক মতসমূহের মধ্যে তুলনা করা হয়, তাকে 'আল-ফিকাহুল মুকারান' বা 'তুলনামূলক ফিকহ' বলে। অন্য কথায় আল-ফিকহুল মুকারান অর্থ হলো বিভিন্ন মতামতের তুলনা করা হয়েছে এমন ফিকহ। ইংরেজিতে একে বলে Comparative Fiqh।

এখানে মুকারানাহ-এর নিম্নোক্ত সংজ্ঞাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। ড. ফাতহী আদ-দুরায়নী বলেন, মুকারান হলো :

مقارنة الرأى بالراى يعني مقابلته وموازنته به ليعرف مدي اتفاقها او اختلافها وأيهما اقوي وأسد بالدليل

একটি মতকে অপর একটি মতের সাথে তুলনা করা অর্থাৎ পরস্পর মোকাবেলা করা এবং তুলনা করা এ উদ্দেশ্যে যে, এর মাধ্যমে দুই মতের মিল বা অমিল এবং দলীলের ভিত্তিতে সবচেয়ে শক্তিশালী ও সঠিক মত কোনটি তা জানা।[৮]

---

৫. ড. মুহাম্মাদ রাওয়াস কালআজী ও ড. হামীদ সাদিক কুনাইবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬২

৬. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান (আল-মুজামুল ওয়াফী)*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ৫ম সংস্করণ, ২০০৮, পৃ. ৮১৩

৭. Dr. ROHI BAALBAKI, *AL-MAWRID (A MODERN ARABIC-ENGLISH DICTIONARY)*, Beirut : Dar El-lm Lilmala-yin, Twelfth Edition, 1990, p. 842, 1085

৮. ড. ফাতহী আদ-দুরায়নী, *বুহুছুন মুকারানাতুন ফিল ফিকহিল ইসলামী ওয়া উসূলিহী*, বৈরূত : মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি., পৃ. ২২

খ. আল-ফিকহুল মুকারান-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা

আল-ফিকহুল মুকারান বা তুলনামূলক ফিকহ পরিভাষাটি আধুনিক হলেও বিষয়টি প্রাচীন। এ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়নের প্রথম ও মধ্যযুগে ইলমুল খিলাফ (علم الخلاف), ফিকহুল খিলাফ (فقه الخلاف), ইলমুল ইখতিলাফ (علم الاختلاف), ইলমুল খিলাফিয়্যাত (علم الخلافيات) ইত্যাদি নামে বিষয়টি পরিচিত ছিল। আধুনিককালের পরিভাষা হওয়ায় এর কোন পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রাচীন গ্রন্থসমূহে না পাওয়াই স্বাভাবিক। আধুনিককালের বেশ কয়েকজন প্রখ্যাত উসূলবিদ আল-ফিকহুল মুকারান-এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মুহাম্মাদ ফাতহী আদ-দুরায়নী (মৃ. ১৯২৩ খ্রি.-১ জুন, ২০১৩ খ্রি.),[৯] উমার সুলায়মান আল-আশকর (জ. ১৯৪০ খ্রি.- মৃ. ১০ আগস্ট, ২০১২ খ্রি.)[১০], মুহাম্মাদ রাফাত উসমান[১১], মাহমুদ আবূ লায়ল[১২], হাসান আহমাদ খাতীব[১৩], শিয়া আইনবিদ মুহাম্মাদ তকী আল-হাকীম (জ. ১৩৩৯ হি.-মৃ. ১৪২৩ হি.)[১৪], আয়াতুল্লাহ শায়খ মুহাম্মাদ ইবরাহীম (জ. ১৯৩২ খ্রি.)[১৫], ড. মুহাম্মাদ আয-যুহায়লী[১৬], ড. আহমাদ ইবনু মানসুর আল-সাবালেক[১৭]।

---

৯. *প্রাগুক্ত*

১০. ড. উমার সুলাইমান আল-আশকর ও অন্যান্য, *মাসাঈল ফিল ফিকহিল মুকারান*, জর্ডান : দারুল নাফায়িস, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি., পৃ. ১১। উল্লেখ্য যে, ড. আল-আশকর তাঁর গ্রন্থে আল-ফিকহুল মুকারান-এর সুসংঘবদ্ধ কোন সংজ্ঞা এ সম্পর্কিত নির্দিষ্ট অধ্যায়ে উল্লেখ করেননি। বরং তিনি আল-ফিকহুল মুকারান-এর বিষয়বস্তু শিরোনামের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম প্যারায় এর বিষয়বস্তু সম্পর্কিত যে আলোচনা করেছেন তাকেই কোন কোন গবেষক আল-ফিকহুল মুকারান-এর সংজ্ঞা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

১১. মুহাম্মাদ রাফাত উসমান ও অন্যান্য, *আল-ফিকহুল মুকারান*, কুয়েত : মাকতাবাতুল ফালাহ, ১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ২১

১২. মাহমুদ আবূ লায়ল ও ড. মাজিদ আবূ রাখিয়্যাহ, *বুহুছুন ফিল ফিকহিল মুকারান*, সংযুক্ত আরব আমিরাত বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৯৭ খ্রি., পৃ. ১৩

১৩. হাসান আহমাদ আল-খাতীব, *আল-ফিকহুল মুকারান*, মিসর : আল-হাইয়াতুল মাসরিয়্যাহ আল-আম্মাহ লিল কিতাব, ১৯৯১ খ্রি., পৃ. ৫০

১৪. আস-সায়্যিদ মুহাম্মাদ তাকী আল-হাকীম, *আল-উসূলুল আম্মাহ লিল ফিকহিল মুকারান*, নাযাফ : মুয়াস-সাসাতু আলিল বায়ত আ., ১৯৭৯ খ্রি., পৃ. ১৩

১৫. আয়াতুল্লাহ শাইখ মুহাম্মাদ ইবরাহীম আল-জান্নাতী, *দুরুসুন ফিল ফিকহিল মুকারান*, কুম্মা : মুজাম্মা আশ-শহীদ আস-সাদার, ১৪১১ হি., পৃ. ৯

১৬. ড. মুহাম্মাদ আয-যুহায়লী, *আল-ফিকহুল মুকারান ওয়া যাওয়াবিতুহু ওয়া ইরতিবাতুহু বি-তাতাওউরি উলুমিল ফিকহিয়্যাহ খিলালাল কারনিল খামিছ আল-হিজরী*, ওয়েবসাইট : http://www.taddart.org/?p=12495 তারিখ : ০১.০৯.২০১৪ খ্রি.

১৭. ড. আহমাদ ইবনে মানসূর আল-সাবালেক, *ফাতহুল ওহহাব ফী বায়ানি মাহিয়াতিল ফিকহিল মুকারান লিত-তুল্লাব*, পৃ. ১২, উদ্ধৃত, ড. আবূ বকর মোঃ জাকারিয়া মজুমদার, *বিভিন্ন ফিকহের তুলনামূলক পর্যালোচনা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৩, পৃ. ১৭৭

নিম্নে তাঁদের প্রদত্ত সংজ্ঞাসমূহের কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:
মুহাম্মাদ রাফাত উসমান -এর মতে আল-ফিকহুল মুকারান হলো,

جمع الاراء الفقهية المختلفة وتقييمها والموازنة بينها بالتماس ادلتها وترجيح بعضها علي بعض
মতানৈক্যপূর্ণ ফিকহী মতসমূহকে একত্র করে সেগুলো মূল্যায়ন ও দলীল অন্বেষণপূর্বক সেগুলোর মধ্যে তুলনা করা এবং একটিকে অপরটির ওপর প্রাধান্য দেয়া।[১৮]

সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ ও ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আয-যুহায়লী 'আল-ফিকহুল মুকারান' এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলেন,

هو دراسة الآراء الفقهية المختلفة في المسألة الواحدة مع مستنداتها من الأدلّة الشرعية، وتقويمها، وبيان ما لها وما عليها بالمناقشة، وإقامة الموازنة بينها، توصلاً إلى معرفة الراجح منها، أو الجمع بينها، أو الإتيان برأي جديد أرجح دليلاً منها.
শরঈ দলীলসমূহের উল্লেখসহ কোন একটি নির্দিষ্ট মাসআলায় বিভিন্ন ফিকহী মতামত অধ্যয়ন ও মূল্যায়ন করা, বিতর্কমূলক আলোচনার মাধ্যমে ঐ মতের পক্ষে ও বিপক্ষের মতামত বর্ণনা করা এবং ঐ মতসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকারযোগ্য মত জানা বা সেগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা কিংবা ঐসব মতের বাইরে দলীলের ভিত্তিতে অগ্রাধিকারযোগ্য নতুন কোন মত/সিদ্ধান্ত উদ্ভাবন করার উদ্দেশ্যে ঐসব মতসমূহের মাঝে তুলনা করা।[১৯]

মুহাম্মদ রুহুল আমিন ও আব্দুল্লাহ আল মাসুদ প্রদত্ত সংজ্ঞাটি হলো :

الفقه المقارن هو جمع اقوال الفقهاء المختلفة في الحكم الشرعي للمسالة الفرعية مع ادلتها ومقابلة بعضها ببعض ثم مناقشتها مناقشة موضوعية وهادئة لاختيار اقوي الاقوال دليلا واقرها لقواعد الشريعة العامة وترجيحها حسب منهج ائمة الترجيح.
তুলনামূলক ফিকহ বলতে ইসলামী আইনের কোন আনুষঙ্গিক বিষয়ে দলীলসহ ফকীহগণের মতবিরোধপূর্ণ বিভিন্ন উক্তি একত্র করে একটির সাথে অন্যটি তুলনা, অতঃপর দলীলের দৃষ্টিকোণ থেকে অধিকতর শক্তিশালী ও ইসলামী শরীআতের সাধারণ নীতিমালার সাথে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ মত নির্বাচনের জন্য নিরপেক্ষ পর্যালোচনা এবং ইমামগণের বর্ণিত অগ্রাধিকার প্রদানের পদ্ধতি অনুযায়ী অগ্রাধিকার প্রদান করাকে বুঝায়।[২০]

---

১৮. মুহাম্মাদ রাফাত উসমান ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

১৯. ড. মুহাম্মাদ আয-যুহায়লী, *প্রাগুক্ত*

২০. মুহাম্মদ রুহুল আমীন ও আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, "তুলনামূলক ফিকহ : ইমাম ও ফকীহগণের মতভেদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের এক অনন্য পদ্ধতি", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ-৫৩, সংখ্যা-২, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩, পৃ. ৫০-৫১

আল-ফিকহুল মুকারান-এর উৎপত্তি

আল-ফিকহুল মুকারান-এর উৎপত্তি দু'ভাবে হয়েছে :

এক. মৌখিক আলোচনার মাধ্যমে উৎপত্তি;
দুই. গ্রন্থ প্রণয়নের মাধ্যমে উৎপত্তি।

বর্তমান প্রবন্ধে যেহেতু আল-ফিকহুল মুকারান-এর গ্রন্থভিত্তিক উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করা হবে সেহেতু মৌখিক আলোচনার মাধ্যমে নয়; বরং গ্রন্থ প্রণয়নের মাধ্যমে আল-ফিকহুল মুকারান-এর উৎপত্তি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

গ্রন্থ প্রণয়নের দিক থেকে আল-ফিকহুল মুকারান-এর উৎপত্তি কোন গ্রন্থটির মাধ্যমে হয়েছে তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। নিম্নে চারটি মত উল্লেখ করা হলো :

প্রথম মত : ইমাম আবু হানীফা রহ. (জ. ৮০ হি.-মৃ. ১৫০ হি.) এর বিখ্যাত ছাত্র বাগদাদের তৎকালীন বিচারপতি ইমাম আবূ ইউসুফ ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম আল-আনসারী (মৃ. ১৮২ হি.) প্রণীত "ইখতিলাফু আবী হানিফা ওয়া ইবনি আবী লায়লা" (اختلاف ابي حنيفة وابن ابي ليلة) গ্রন্থের ভূমিকায় ভারতের মাদরাসায়ে নিযামিয়াহ-এর শিক্ষক এবং লাজনাতু ইহ্‌য়াইল মাআরিফ আল-উছমানিয়্যাহ-এর প্রধান আবুল ওয়াফা আল-আফগানী মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ হিসেবে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর ইখতিলাফুস সাহাবাহ (اختلاف الصحابة) গ্রন্থটির নাম উল্লেখ করেছেন।[২১]

দ্বিতীয় মত : কুয়েতের ফিক্‌হ বিশ্বকোষ "আল-মাওসূ'আহ আল-ফিকহিয়্যাহ" (الموسوعة الفقهية)-এর গবেষক শাইখ আব্দুল্লাহ নাজীব সালিম এর লেখা "আত-তা'রীফ বি-'ইলমিল খিলাফ" (التعريف بعلم الخلاف) প্রবন্ধে দাবি করেছেন ইমাম আবু হানীফার বিখ্যাত ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ রহ. (মৃ. ১৮২ হি.) "ইখতিলাফু আবী হানীফা ওয়া ইবনি আবী লায়লা" (اختلاف ابى حنيفة وابن ابى ليلة) নামে সর্বপ্রথম এ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তবে তিনি ইমাম আদ-দাবুসী আল-হানাফীকে এ শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর লেখা "তাসীসুন নায্‌র" (تأسيس النظر) এবং "আত-তা'লীকাহ ফী মাসাইলিল খিলাফ বায়নাল আয়িম্মাহ" (التعليقة في مسائل الخلاف بين الائمة) গ্রন্থদ্বয় এ শাস্ত্রে পদ্ধতিগত প্রথম গ্রন্থ।

---

২১. ইমাম আবূ ইউসুফ, *ইখতিলাফু আবী হানীফা ওয়া ইবনি আবী লায়লা*, হায়দারাবাদ : মাতবাআতুল ওয়াফা, ১৩৫৭ হি., পৃ. ৩

তৃতীয় মত : বাংলাদেশের কুষ্টিয়াস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আবূ বকর মোঃ জাকারিয়া মজুমদার প্রণীত বিভিন্ন ফিকহের তুলনামূলক পর্যালোচনা গ্রন্থে তুলনামূলক ফিকহ-এর ওপর লেখা সর্বপ্রথম গ্রন্থ হিসেবে ইমাম ইবন জারীর আত-তাবারী রহ. (জ. ২২৪ হি.- মৃ. ৩১০ হি.) প্রণীত **"ইখতিলাফুল ফুকাহা"** (اختلاف الفقهاء)কে উল্লেখ করেছেন।[২২]

চতুর্থ মত : কোন কোন গবেষক ইমাম আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (জ. ২৩৮ হি.-মৃ. ৩২১হি.) প্রণীত ইখতিলাফুল ফুকাহা (اختلاف الفقهاء) ও শারহি মা'আনিল আছার (شرح معاني الآثار) গ্রন্থদ্বয়কে এবং ইবনু মুনযির (জ. ২৪২ হি.- মৃ ৩১৯ হি.) প্রণীত আল-ইশরাফ আলা মাযাহিবিল উলামা (الاشراف على مذاهب العلماء), আল আওসাত ফিস-সুনান ওয়াল ইজমা ওয়াল ইখতিলাফ (الاوسط فى السنن والاجماع والاختلاف), ইখতিলাফুল উলামা (اختلاف العلماء) ইত্যাদি গ্রন্থাবলিকেও স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে আল-ফিকহুল মুকারান-এর প্রথম-গ্রন্থ বলে অভিহিত করেছেন।[২৩]

উপর্যুক্ত চারটি মত পর্যালোচনা করে দেখা যায়, তুলনামূলক ফিকহ-এর ওপরে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপরোক্ত গ্রন্থাবলিই প্রথম। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে প্রত্যেকটি গ্রন্থকে অন্য গ্রন্থগুলোর ওপর অগ্রাধিকার দেয়া যায়। তবে সাধারণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতা অনুযায়ী ইমাম আবূ হানীফা রহ. (জ. ৮০ হি.-মৃ. ১৫০ হি.) প্রণীত ইখতিলাফুস সাহাবাহ (اختلاف الصحابة) গ্রন্থটিকে এ শাস্ত্রের প্রথম গ্রন্থ হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারত। তবে যেহেতু এ গ্রন্থটি আধুনিক আল-ফিকহুল মুকারান-এর পদ্ধতিতে লিখিত নয় তাই এটিকে এ বিষয়ে প্রণীত প্রথম গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত না করে বরং ইমাম ইবন জারীর আত-তাবারী প্রণীত "ইখতিলাফুল ফুকাহা" (اختلاف الفقهاء) গ্রন্থটিকে বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ এ গ্রন্থটিতেই মোটামুটি আল-ফিকহুল মুকারান-এর পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

আল-ফিকহুল মুকারান-এর গ্রন্থভিত্তিক ক্রমবিকাশ

আল-ফিকহুল মুকারান-এর উৎপত্তির পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত এ বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ লেখা হয়েছে। এ শাস্ত্রের পণ্ডিতদের হাতে রচিত গ্রন্থাবলিই কালক্রমে শাস্ত্রটিকে বিকশিত করেছে। প্রবন্ধের এ পর্যায়ে হিজরী ২য় শতাব্দী থেকে হিজরী ৭ম শতাব্দী

---

২২. ড. আবু বকর মোঃ যাকারিয়া মজুমদার, *প্রাগুক্ত*

২৩. ড. মুহাম্মাদ রিযা রিযওয়ান তলাব ও ড. মুহাম্মাদ মাঈনী ফাররা, *আল ফিকহুল মুকারান : তাতাওউরাতুহু ওয়া আদাউহু ফিততাকরীব বায়নাল মাযাহিব আল ইসলামিয়্যাহ,* ওয়েবসাইট : http://taghrib.org/pages/content.php?tid=46 তারিখ : ০১.০৯.২০১৪ খ্রি.

পর্যন্ত সময়কালে তুলনামূলক ফিকহ্-এর ওপর লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হলো। এই তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে লেখকের মৃত্যুসালকে ভিত্তি ধরা হয়েছে।[২৪]

হিজরী ২য় শতাব্দী

হিজরী ২য় শতাব্দী উৎপত্তি-শতাব্দী হওয়ায় এ শতাব্দীতে লেখা খুব বেশি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তার কোনটিই আধুনিককালের পদ্ধতিতে সাজানো নয়। তবে উৎপত্তি-শতাব্দী হিসাবে এ শতাব্দীতে লিখিত এ বিষয়ক গ্রন্থসমূহ যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করে। নিম্নে কয়েকটি গ্রন্থের আলোচনা পেশ করা হলোঃ

১. ইখতিলাফুস সাহাবা (إختلاف الصحابة)

ইমাম আবু হানীফা রহ. (জ. ৮০ হি.-মৃ. ১৫০ হি.) প্রণীত এ গ্রন্থটিকে তুলনামূলক ফিকহ শাস্ত্রের ওপর লিখিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।[২৫]

২. ইখতিলাফু আবী হানীফা ওয়া ইবনু আবী লাইলা (إختلاف ابى حنيفة وابن ابى ليلة)

এই গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন ইমাম আবূ হানীফার বিখ্যাত শিষ্য ও বাগদাদের প্রধান বিচারপতি ইমাম আবূ ইউসুফ ইয়াকুব ইবনু ইবরাহীম আল-আনসারী (মৃ. ১৮২হি.)। তিনি তার শিক্ষা জীবনের প্রথম দিকে ইমাম ইবনু আবী লায়লা[২৬] (জ. ৭৪ হি.-মৃ. ১৪৮ হি.) এর শাগরেদ হিসেবে তার কাছ থেকে ফিকহী জ্ঞান অর্জন করেন এবং পরবর্তীতে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এর ফলে তিনি বিভিন্ন ফিকহী বিষয়ে দুই জন বিখ্যাত ফকীহ্‌র মতবিরোধ দেখতে পান। সে জন্যই এ গ্রন্থে দেখা যায়, কিছু মাসআলায় তিনি আবু হানীফা'র মতকে গ্রহণ করেছেন। আবার কিছু মাসআলায় ইবনু আবী লায়লা'র মতকে শক্তিশালী মনে করেছেন। তাই তিনি এই গ্রন্থের নামকরণ করেছেন 'ইখতিলাফু আবী হানীফা ওয়া ইবনি আবী লায়লা, অর্থাৎ আবূ হানীফা ও ইবনু আবী লায়লার মধ্যে মতপার্থক্য।[২৭]

---

২৪. উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম হতো যদি গ্রন্থ প্রণয়নের সালকে ভিত্তি হিসাবে ধরা যেতো। কিন্তু সবগুলো গ্রন্থের প্রণয়ন সাল জানা সম্ভব হয়নি বলে তা আর করা সম্ভব হলো না।

২৫. ইমাম আবূ ইউসুফ প্রণীত 'ইখতিলাফু আবী হানীফা ও ইবনে আবী লাইলা' গ্রন্থে আবুল ওয়াফা আল আফগানী কর্তৃক লিখিত ভূমিকায় ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে আমরা তা নিশ্চিত হতে পারিনি। দ্র. ইমাম আবূ ইউসুফ, *প্রাগুক্ত*

২৬. পূর্ণ নাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর রহমান ইবন আবী লায়লা।

২৭. ইমাম আবু ইউসুফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩

৩. আর-রাদ্দু 'আলা সিয়ারিল আওয়া'ঈ (الرد على سير الاوزاعى)
ইমাম আবূ ইউসুফ-এর লেখা ফিকহের তুলনামূলক আলোচনাসমৃদ্ধ অন্য একটি গ্রন্থ হলো আর-রাদ্দু 'আলা সিয়ারিল আওযা'ঈ (الرد على سير الاوزاعى)।[২৮] এই গ্রন্থে লেখক ইমাম আল আওযা'ঈর লেখা সিয়ারুল আওযা'ঈ (سير الاوزاعى) এর জবাব দিয়েছেন। গ্রন্থটিকে তুলনামূলক ফিকহের প্রাচীন গ্রন্থসমূহের অন্যতম হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[২৯] এ বিষয়ে ইমাম আবূ ইউসুফ এর লেখা কিতাবুর রদ্দি আলা মালিক ইবনি আনাস (كتاب الرد علي مالك بن انس) শিরোনামের গ্রন্থটির নামও পাওয়া যায়, যেখানে লেখক ইমাম মালিক রহ. এর ফিকহী মতের বিরোধিতা করেছেন। তবে এ গ্রন্থটি এখন পাওয়া যায় না।[৩০] তাছাড়া ইমাম মালিক তাঁর মুওয়াত্তায় ইমাম লাইস ইবনু সা'দ (জ. ৯৪ হি.-মৃ. ১৭৫ হি.)-এর কাছে লিখিত পত্রও সংযুক্ত করেছেন।[৩১]

৪. কিতাবুল হুজ্জাহ 'আলা আহলিল মাদীনাহ (كتاب الحجة علي اهل المدينة)
এ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন ইমাম হাফিয আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী (মৃ. ১৮৯ হি.)। গ্রন্থটি তাসহীহ করেছেন এবং টীকা লিখেছেন আল্লামা সায়্যিদ মাহদী হাসান আল-কিলানী আল-কাদিরী।[৩২] এ গ্রন্থটি তুলনামূলক ফিকহ-এর ইতিহাসে অনন্য উজ্জ্বল নক্ষত্র।

হিজরী ৩য় শতাব্দী

হিজরী ২য় শতাব্দীর ন্যায় ৩য় শতাব্দীতেও প্রখ্যাত ইমামগণের মধ্যকার মতপার্থক্য ও বিতর্ক বিভিন্ন গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে সেসব গ্রন্থের সংখ্যা মাত্র কয়েকটি। এ শতাব্দীতে যে গ্রন্থ সমূহ এ বিষয়ের বলে মনে করা হয় সেগুলো হলো:

১. ইখতিলাফু আবী হানীফা ওয়াল আওযা'ঈ (إختلاف ابى حنيفة والاوزاعى)
এ গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আল-আওযাঈ'র (জ. ৮৮ হি.-মৃ. ১৫৭ হি.) মধ্যকার মতপার্থক্য আলোচিত হয়েছে।

---

২৮. গ্রন্থটির তাসহীহ করেছেন ও এর উপর টীকা লিখেছেন আবুল ওয়াফা আল আফগানী।

২৯. গ্রন্থটির কোন কপি ভারত ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও ছিল না। তাই ভারতের হায়দারাবাদের লাজনাতু ইহ্ইয়াইল মা'আরিফ আল-উছমানিয়া এই গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ নেয় এবং আবুল ওয়াফা আল-আফিগানীর টীকা, বিশ্লেষণ, তাহকীক, তাসহীহসহ ১৩৫৭ হিজরী সালের রমাযান মাসে ১৪৬ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

৩০. ড. মুহাম্মাদ রিযা রিযওয়ান তলাব ও ড. মুহাম্মাদ মাঈনী ফাররা, *প্রাগুক্ত*

৩১. মুহাম্মদ রুহুল আমীন ও আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯

৩২. বৈরূতের আলামুল কুতুব প্রকাশনা সংস্থা থেকে চার খণ্ডে সমাপ্ত এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।

২. ইখতিলাফুশ শাফিঈ মাআ মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (إختلاف الشافعي مع محمد بن الحسن)
এ গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ আশ-শায়বানীর সাথে ইমাম আশ-শাফিঈ'র মতপার্থক্য বর্ণিত হয়েছে।

৩. ইখতিলাফুশ শাফিঈ মা'আ মালিক (اختلاف الشافعي مع مالك)
এ গ্রন্থে ইমাম মালিকের সাথে ইমাম শাফিঈর মতপার্থক্য সমূহ উল্লিখিত হয়েছে।
উপযুক্ত তিনটি গ্রন্থই ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস আশ-শাফিঈ (জ. ১৫০ হি.-মৃ. ২০৪ হি.) এর লেখা এবং সবগুলোই তার বিখ্যাত আল-উম্ম গ্রন্থে সংকলিত রয়েছে। এ তিনটি ছাড়াও আল-উম্ম গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফার ও ইবন আবূ লায়লার (মৃ. ৮৩ হি.) সাথে তার মতপার্থক্য উল্লেখ করেছেন। প্রথমোক্ত তিনটি গ্রন্থের শেষ দুটিতে যথাক্রমে ইমাম মুহাম্মাদ আশ শায়বানী ও ইমাম মালিকের সাথে ইমাম শাফিঈ তার নিজের মতপার্থক্যগুলো বর্ণনা করেছেন।[৩৩] অন্য এক সূত্রে জানা যায় যে, ইমাম শাফিঈ তার আল-উম্ম গ্রন্থে আলী রা. ও আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. এর মধ্যকার মতপার্থক্যও আলোচনা করেছেন।[৩৪]

উপর্যুক্ত গ্রন্থাবলি ছাড়াও এ বিষয়ে ইমাম শাফিঈ'র-এর আল-ইজমা ওয়াল ইখতিলাফ (الاجماع والاختلاف) নামে একটি গ্রন্থের কথা ড. আবূ বকর মো: যাকারিয়া মজুমদার তাঁর গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনুল নাদীমের আল-ফিহরিস্ত গ্রন্থের রেফারেন্স দিয়ে উল্লেখ করেছেন।[৩৫] কিন্তু আমরা ঐ গ্রন্থ খুঁজে ইমাম শাফিঈ'র লেখা ঐ নামের কোন গ্রন্থের সন্ধান পাইনি। ঐ নামের যে গ্রন্থটির উল্লেখ আল-ফিহরিস্ত-এ রয়েছে সেটির লেখক হলেন আবূ আব্দির রহমান আশ-শাফিঈ; যিনি ইমাম শাফিঈ নন।

৪. ইখতিলাফুল উলামা (إختلاف العلماء)
তুলনামুলক ফিকহ-এর ওপর লিখিত প্রাচীন গ্রন্থসমূহের মধ্যে আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন নাসর আল-মারওয়াযী (জ. ২০২ হি.-মৃ. ২৯৪ হি.) লিখিত এ গ্রন্থটি অন্যতম। বাগদাদে জন্ম নেয়া ও নিশাপুর বেড়ে ওঠা এ লেখক জ্ঞান অর্জনে বহু দেশ সফর করেছেন। সাহাবীগণ ও তাদের পরবর্তীদের মাঝে আহকাম বিষয়ক ইখতিলাফ সম্পর্কে লেখকের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। লেখক এ গ্রন্থে মতানৈক্যপূর্ণ বহু মাসআলাহ একত্র করেছেন। একই সাথে তিনি ঐসব মাসআলার দলীলসমূহ উল্লেখ করে কোন নির্দিষ্ট ইমামের বা আলিমের প্রতি কোনরূপ গোঁড়ামি না করে দলীলের ভিত্তিতে

---

৩৩. ইমাম শাফিঈ, *আল-উম্ম*, বৈরূত : দারুল ফিকর, প্রথম প্রকাশ ১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি., দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি., মোট খণ্ড ৮
৩৪. ড. মুহাম্মাদ রিযা রিযওয়ান তলাব, *প্রাগুক্ত*
৩৫. ড. আবু বকর মো : যাকারিয়া মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৭

একটি মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। লেখক তার গ্রন্থে যে কোন মাসআলায় সুফিয়ান আছ-ছাওরী'র মত উল্লেখ করে তারপর অন্যান্য ফকীহগণের মতামত উল্লেখ করেছেন।[৩৬]

এগুলো ছাড়া মুহাম্মাদ ইবনে উমার আল-ওয়াকিদী (মৃ. ২০৯ হি.)-এর লেখা কিতাবুল ইখতিলাফ (كتاب الاختلاف) নামে একটি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়।[৩৭]

হিজরী ৪র্থ শতাব্দী

হিজরী ২য় ও ৩য় শতাব্দীতে ফিকহী ইখতিলাফ সম্পর্কে সীমিত আকারে কিছু গ্রন্থ রচিত হলেও তা পূর্ণাঙ্গ আল-ফিকহুল মুকারান-এর পদ্ধতি মুতাবিক ছিলনা। হিজরী ৪র্থ শতাব্দীতে প্রখ্যাত আঁলিম ফকীহগণের হাতে এ শাস্ত্রটি ক্রমশ শাস্ত্রীয় অবকাঠামো লাভ করতে এবং বিকশিত হতে থাকে। এ শতাব্দীতেও তুলনামূলক ফিকহ বিষয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো :

১. কিতাবু ইখতিলাফিল ফুকাহা আল-কাবীর (كتاب اختلاف الفقهاء الكبير)

এ গ্রন্থটি লিখেছেন ইমাম আহমাদ ইবন নাসর আল-মারওয়াযী (মৃ. ৩০৫ হি.)। একই লেখকের লেখা এ বিষয়ে কিতাবু ইখতিলাফিল ফুকাহা আস-সগীর (كتاب اختلاف الفقهاء الصغير) নামেও একটি গ্রন্থের নাম জানা যায়। তবে এই গ্রন্থ দুটির কোন কপির সন্ধান আমরা পাইনি বিধায় এগুলোর বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি, শুধু এতটুকু অনুমান করা হয় যে, গ্রন্থদুটিতে ফিকহের বিভিন্ন বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।[৩৮]

২. কিতাবুল ইখতিলাফ ফিল ফিকহ (كتاب الاختلاف في الفقه)

ইমাম আবূ ইয়াহয়া যাকারিয়া ইবন ইয়াহয়া ইবনু মুহাম্মাদ আস-সাজী (মৃ. ৩০৭ হি.) লিখিত এ গ্রন্থটিও আল-ফিকহুল মুকারান বিষয়ে লেখা বলে অনুমান করা হয়।[৩৯]

---

৩৬. আস সায়্যিদ সুবহী আস সামিরাই এর বিশ্লেষণ (তাহকীক) সহ এক খণ্ডে এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।

৩৭. ড. আবু বকর মো : যাকারিয়া মজুমদার, *প্রাগুক্ত*

৩৮. গ্রন্থদুটির নাম ইবনু নাদীম তার *আল-ফিহরিস্ত* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এই সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে আমরা তা নিশ্চিত হতে পারিনি।

৩৯. ইবনুন নাদীম *'আল-ফিহরিসত'* গ্রন্থের মধ্যে, 'আল্লামা সুবকী তাঁর *'তাবাকাতুশ শাফি'ইয়াতিল কুবরা'*-এর মধ্যে, ইবনু কাযী শাহবাহ তাঁর *'আত-তাবাকাতুশ শাফি'ইয়াহ'*-এর মধ্যে, যিরকলী তাঁর *'আল-আ'লাম'*-এর মধ্যে, ইবনু মানযূর তাঁর *'তাবাকাতুল ফুকাহা'র* মধ্যে *'ইখতিলাফুল ফুকাহা'* নামে কিতাবটির কথা উল্লেখ করেছেন।

৩. ইখতিলাফুল ফুকাহা (إختلاف الفقهاء)

প্রখ্যাত মুজতাহিদ, মুফাসসির ও ইতিহাসবিদ ইমাম আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত-তাবারীর (জ. ২২৪ হি.-মৃ. ৩১০ হি.) লেখা অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ হলো ইখতিলাফুল ফুকাহা (إختلاف الفقهاء)। তাবারিস্তানের আমুল নামক স্থানে জন্ম নেয়া এ লেখক জ্ঞান অর্জনে বাগদাদ যান এবং সেখানেই মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ইলমুল ইখতিলাফ এর ওপর লেখা তার এ গ্রন্থটিকে এ বিষয়ে লেখা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি এই গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা (জ. ৮০ হি.-মৃ. ১৫০ হি.) ইমাম মালিক (জ. ৯৩ হি.-মৃ. ১৭৯) ইমাম আশ শাফিঈ (জ. ১৫০ হি.-মৃ. ২০৪ হি.) ইমাম আল-আওযাঈ (জ. ৮৮ হি.-মৃ. ১৫৭ হি.) ও ইমাম আবূ ছাওর (মৃ.২৪০ হি.)-এর মতানৈক্যসমূহ উল্লেখ করেছেন। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, তিনি তাঁর এ গ্রন্থে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল (জ. ১৬৪ হি.-মৃ. ২৪১ হি.) এর মত উল্লেখ করেননি। এর কারণ হিসেবে বলেছেন, لم يكن فقيهاً، وإنّما كان محدّثاً অর্থাৎ "তিনি (ইমাম আহমাদ) ফকীহ ছিলেন না; বরং তিনি শুধু মুহাদ্দিস ছিলেন।"[৪০] যদিও তাঁর এই দাবি বাস্তবসম্মত নয়।

তার এই অপূর্ণাঙ্গ গ্রন্থটি দু'টি ভাগে বিভক্ত ছিল।

এক. ফিল মুআমালাতিল মালিয়্যাহ (অর্থনৈতিক লেনদেন সম্পর্কে);

দুই. ফিল জিহাদি ওয়াল মুহারিবীন (জিহাদ ও যুদ্ধ সম্পর্কে)।

৪. আল-ইশরাফ আলা মাযাহিবিল উলামা (الاشراف على مذاهب العلماء)

তুলনামূলক ফিকহের ওপর লেখা প্রাচীন এ গ্রন্থটির লেখক হলেন আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম ইবনুল মুনযির (জ. ২৪২ হি.-মৃ. ৩১৮ হি.)। লেখক এ গ্রন্থে একটি মাসআলার ক্ষেত্রে আমিলগণের মতামত ও তাদের পেশকৃত দলীলসমূহ বর্ণনা করে যে মতটি দলীলের ভিত্তিতে শক্তিশালী মনে হয়েছে সেটিকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসরণ করতেন না। বরং তিনি সহীহ দলীলের ভিত্তিতে মতামত দিতেন। কে ঐ মতের পক্ষে বা বিপক্ষে তাকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। এ গ্রন্থটির পাঁচ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। পাঁচ খণ্ডের বিষয়সমূহ হলো : মুআমালাত, জিহাদ, হুদূদ ও পারিবারিক আইন। গ্রন্থটির নামে العلماء শব্দটির স্থানে اهل العلم শব্দদ্বয়ও পাওয়া যায়। প্রখ্যাত এ ফকীহ ও মুহাদ্দিস

---

৪০. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, তাহকীক : খায়রী সা'ঈদ, কায়রো : আল-মাকতাবা আত-তাওফীকিয়্যাহ, তা. বি., খ. ৭, পৃ. ১৬

তুলনামূলক ফিকহর বিষয়ের ওপর এটি ছাড়াও বেশ কিছু গ্রন্থ লিখেছেন। যেমন, আল আওসাত ফিস-সুনান ওয়াল ইজমা ওয়াল ইখতিলাফ (الاوسط فى السنن والاجماع والاختلاف), ইখতিলাফুল উলামা (اختلاف العلماء) ইত্যাদি।

উপরোক্ত গ্রন্থাবলি ছাড়াও এ বিষয়ে লেখা আরো কিছু গ্রন্থ হলো, আবূ ইসহাক ইবনু ইবরাহীম ইবনু জাবির আল-বাগদাদী (মৃ. ৩১০ হি.) প্রণীত কিতাবুল ইখতিলাফ (كتاب الاختلاف), প্রখ্যাত আলিম ইমাম আবূ জাফর আত-তাহাভী (মৃ. ৩২১ হি.) প্রণীত ইখতিলাফুল ফুকাহা (اختلاف الفقهاء) ও হাদীসভিত্তিক গ্রন্থ শারহু মা'আনিল আছার (شرح معانى الاثار), আবু বাকর আল-জাসসাস (মৃ. ৩৭০ হি.) প্রণীত তাফসীরভিত্তিক গ্রন্থ আহকামুল কুরআন (احكام القران), আবুল লাইস নাসর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আস-সামারকান্দী (মৃ. ৩৭৩) প্রণীত মুখতালাফুর রিওয়ায়াহ বাইনা আবী হানীফা ওয়া মালিক ওয়াশ শাফিঈ (مختلف الرواية بين ابى حنيفة ومالك والشافعى), কাযী আবুল হাসান ইবনুল কাসসার (মৃ. ৩৯৮ হি.) প্রণীত উয়ূনুল আদিল্লাত ফী মাসাইলিল খিলাফ বাইনা ফুকাহাইল আমসার (عيون الادلة فى مسائل الخلاف بين فقهاء الامصار) ইত্যাদি।

হিজরী ৫ম শতাব্দী

হিজরী ৫ম শতাব্দীতে এসে আল-ফিকহুল মুকারান-এর ওপর এমন কয়েকটি গ্রন্থ প্রণীত হয় যেগুলো এই শাস্ত্রের শক্ত ভিত রচনা করে। কারো কারো মতে এ শতাব্দীতেই আল-ফিকহুল মুকারান-এর ভিত্তি স্থাপিত হয়। এ শতাব্দীতে প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো :

১. তাসীসুন নাযর (تأسيس النظر)

প্রখ্যাত আলিম ফকীহ আবূ যায়দ উবায়দুল্লাহ ইবন উমার আদ-দাবূসী (মৃ. ৪৩০ হি.) এই গ্রন্থটি লেখার কারণেই ইলমুল খিলাফ-এ তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম ইলমুল খিলাফ-এর ভিত্তি স্থাপন করেন এবং একে স্থায়ীত্বের দিকে নিয়ে যান। লেখক এ গ্রন্থটিকে আট ভাগে বিভক্ত করেছেন। সে ভাগগুলো হলো :

১. ইমাম আবূ হানীফা'র সাথে তার দুই ছাত্র আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান-এর মতবিরোধ।
২. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান-এর সাথে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ-এর মতবিরোধ।
৩. আবূ ইউসূফ-এর সাথে আবূ হানীফা ও মুহাম্মাদ-এর মতবিরোধ।
৪. মুহাম্মাদ-এর সাথে আবূ ইউসুফ-এর মতবিরোধ।
৫. যুফার-এর সাথে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ও আল হাসান ইবনু যিয়াদ-এর মতবিরোধ।

৬. ইমাম মালিক-এর সাথে হানাফীগণের মতবিরোধ।
৭. ইবন আবী লায়লা-এর সাথে মুহাম্মাদ, হাসান ইবনু যিয়াদ ও যুফার-এর মতবিরোধ।
৮. ইমাম শাফিয়ী'র সাথে হানাফীগণের মতবিরোধ।

ফকীহগণের মাঝে ইখতিলাফের মূলনীতি অনুসারে লেখক এই আট প্রকার আলোচনার চেষ্টা করেছেন। আর তা হলো মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা সমূহকে মূলনীতির আলোকে বিশ্লেষণ করা। এই গ্রন্থটিকে তুলনামূলক ফিকহের এবং ইলমুল খিলাফের ওপর সর্বপ্রথম স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে কোন কোন গবেষক উল্লেখ করেছেন। লেখক এ গ্রন্থে ফকীহগণের মতের ক্ষেত্রে শারঈ দলীল পেশ করার এবং সন্দেহ অপনোদনের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। এই লেখকই আত-তা'লীকাতু ফী মাসাইলিল খিলাফ বায়নাল আয়িম্মাহ (التعليقة في مسائل الخلاف بين الائمة) নামে এ বিষয়েই আরেকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

২. আল-হাভীল কাবীর (الحاوى الكبير)

আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাবীব আল-মাওয়ারদী (জ. ৩৬৪ হি.- মৃ. ৪৫০হি.) এর লেখা এ গ্রন্থটিকে আল-মুযানী'র আল-মুখতাসার (المختصر) গ্রন্থের ব্যাখ্যা হিসেবে মনে করা হয়। কিন্তু লেখক এ গ্রন্থে শুধু শাফিঈ মাযহাবের মতামতের ওপর সীমাবদ্ধ না থেকে তিনি এতে অন্যান্য ফিকহী মাযহাব গুলোর ফকীহগণের মতসমূহ দলীলসহ বিস্তারিতভাবে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। লেখক সম্পর্কে ইবন খাল্লিকান বলেন,

لم يطالعه احد الا شهد له بالتبحر والمعرفة التامة في المذهب واختلاف الفقهاء

> যে ব্যক্তিই তার এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছে সেই মাযহাব এবং ফকীহগণের ইখতিলাফ সম্পর্কে লেখকের জ্ঞানের গভীরতা, ব্যাপকতা, বিশালতা ও পূর্ণতা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।[৪১]

১৯ খণ্ডে প্রকাশিত এ গ্রন্থটি বিশ্লেষণ (তাহকীক) করেছেন শাইখ আলী মুহাম্মাদ মুআওয়িয ও শায়খ আদিল আহমাদ আব্দুল মাওজূদ।

৩. আল-মুহাল্লা (المحلى)

এ গ্রন্থটির পূর্ণ নাম হলো আল-মুহাল্লা বিল-আছার শারহুল মুজাল্লা বিল ইখতিসার (المحلي بالاثار شرح المجلي بالاختصار) তুলনামূলক ফিকহের ওপর লেখা অন্যতম শ্রেষ্ঠ এ

---

৪১. http://www.alukah.net/web/fouad/0/32660/ Date : 21.08.2014

গ্রন্থটি লিখেছেন আবূ মুহাম্মাদ আলী ইবন আহমাদ ইবন হাযম আল আন্দালুসী (জ. ৩৮৪ হি./মৃ. ৪৫৬ হি., জ. ৯৯৫ খ্রি./মৃ. ১০৬৩ খ্রি.)। তিনি প্রথমে মালিকী, অতঃপর শাফিয়ী মাযহাবের শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি নিজেই একটি স্বতন্ত্র মতাবলম্বন করেন, যা যাহিরী মত নামে পরিচিত। তাঁর মাযহাবের কারণে তিনি আলিম সমাজে চরম বিতর্কিত হলেও তাঁর লেখা এ বিখ্যাত গ্রন্থটির অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনি উদারমনা আলিম সমাজের নিকট যথেষ্ট শ্রদ্ধেয়। তাঁর আল-মুহাল্লা গ্রন্থটিকে আধুনিককালের আল-ফিকহুল মুকারানের ওপর বিশ্বকোষও আখ্যায়িত করা যায়। তিনি এ গ্রন্থে তার সমকালীন ও পূর্বসূরী আলিম-ফকীহগণের বিশেষ করে প্রসিদ্ধ চারটি মাযহাব (হানাফী, মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী)-এর এবং স্বল্প প্রসিদ্ধ মাযহাবসমূহের মতামত উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি ইমাম শাফিঈ, মালিক, আবূ হানীফা ও আহমাদ ইবন হাম্বলের মতামতকে পরস্পরের সাথে তুলনা করে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে শক্তিশালী মততে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ব্যক্তি হিসেবে লেখকের প্রতি কারো বিরাগ থাকলেও তার লেখা বিখ্যাত এ গ্রন্থটি যে আল-ফিকহুল মুকারানের তথা তুলনামূলক ফিকহ গবেষকদের জন্য অবশ্য পাঠ্য সে ব্যাপারে কারো সন্দেহ নেই।

৪. আল-মুআওয়্যানাহ ফিল জাদাল (المعونة في الجدل)

আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবন আলী আশ-শীরাযী (জ. ৩৯৩ হি.-মৃ. ৪৭৬ হি.) কর্তৃক রচিত এ গ্রন্থটি পঞ্চম শতাব্দীতে লেখা তুলনামূলক ফিকহের অন্যতম গ্রন্থ।[৪২] এ গ্রন্থে লেখক কিছু মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা দলীলসহ উল্লেখ করে নিজ মতের বিপক্ষের মতসমূহ খণ্ডন করেছেন। লেখক গ্রন্থটিতে দলীল পেশ, প্রশ্নোত্তর, বিতর্ক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এ সবকিছুই তিনি জ্ঞান-গবেষণার বিধান অনুযায়ী করেছেন।

উপরোল্লিখিত গ্রন্থাবলি ছাড়াও এ বিষয়ে লেখা আরো কিছু গ্রন্থ হলো, আল-হাসান আল-ওয়াররাফ হাসান ইবনু হামিদ ইবনু আলী ইবনু মারওয়ান আল-বাগদাদী (মৃ. ৪০৩ হি.) প্রণীত ইখতিলাফুল ফুকাহা (اختلاف الفقهاء), আব্দুল ওয়াহহাব ইবনু নাস্‌র আল-মালিকী (মৃ. ৪২২ হি.) লিখিত আত-তালীক (التعليق), আবুল হুসাইন আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-কুদূরী আল-হানাফী (মৃ. ৪২৮ হি.) প্রণীত আত-তাজরীদ (التجريد), ইমাম বাইহাকী আশ-শাফিঈ (মৃ. ৪৫৮ হি.) প্রণীত আল-খিলাফিয়্যাত (الخلافيات), খ্যাতনামা আলিম ইমাম ইবনু আব্দিল বার (জ. ৩৬৮হি.-

---

৪২. গ্রন্থটি ১৪০৭ হিজরী সালে কুয়েতের জমঈয়্যাতু ইহইয়াইত তুরাছিল ইসলামী কর্তৃক একটি সংক্ষিপ্ত খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি তাহকীক করেছেন ড. আলী আব্দুল আযীয আল উমায়রীনী।

মৃ. ৪৬৩ হি.) প্রণীত আল-ইসতিযকার (الاستذكار) ও আত-তামহীদ (التمهيد), আবু ইসহাক আশ-শিরাযী প্রণীত আন-নুকূত (النكت/النقاط) ও তাযকিরাতুল খিলাফ (تذكرة الخلاف), ইমামুল হারামাইন আল-জুয়াইনী (মৃ. ৪৭৮ হি.) প্রণীত মুগীছুল খালক ফী ইখতিয়ারিল আহাক্ক (مغيث الخلق فى اختيار الاحق), ইবনু জাম'আহ আশ-শাফিঈ (মৃ. ৪৮০ হি.) প্রণীত আল-ওয়াসায়িল ফী ফুরুকিল মাসায়িল (الوسائل فى فروق المسائل), আলী ইবনু সাঈদ ইবনু আব্দুর রহমান আল-বাগদাদী আশ-শাফিঈ (মৃ. ৪৯৩ হি.) প্রণীত মুখতাসারুল কিফায়াহ (مختصر الكفاية)। এই গ্রন্থটি মাসায়িলুল খিলাফ (مسائل الخلاف) ও আল-কিফায়াহ (الكفاية) নামেও পরিচিত।

হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দী

বিগত শতাব্দীগুলোর ধারাবাহিকতায় এ শতাব্দীতেও আল-ফিকহুল মুকারান বিষয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ প্রণীত হয়। বলা হয় আল-ফিকহুল মুকারান-এর ওপর সর্বশেষ্ঠ গ্রন্থ এ শতাব্দীতেই রচিত হয়। আর সেটি হলো বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ (بداية المجتهد ونهاية المقتصد)। এ শতাব্দীতে লেখা সবগুলো গ্রন্থ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা না করে কয়েকটি গ্রন্থ সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল।

১. হিলইয়াতুল উলামা ফী মারিফাতি মাযাহিবিল ফুকাহা (حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء) বা হিলইয়াতুল উলামা ফী ইখতিলাফিল ফুকাহা (حلية العلماء فى اختلاف الفقهاء)

আবূ বাকর মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনুল হুসাইন আশ-শাশী আল-কাফফাল (জ. ৪২৯ হি.-মৃ. ৫০৭ হি.) লিখিত এ গ্রন্থটিতে তিনি মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহের ক্ষেত্রে ফকীহগণের মতামত একত্র করেছেন। এই গ্রন্থটি আল মুসতাযহারী (المستظهرى) নামেও পরিচিত। কারণ, লেখক এ গ্রন্থটি খলীফা আল-মুসতাযহির বিল্লাহ-এর জন্যে লিখেছিলেন।[৪৩]

২. তরীকাতুল খিলাফ ফিল ফিকহি বাইনাল আইম্মাতিল আসলাফ (طريقة الخلاف فى الفقه بين الائمة الاسلاف)

সমরকন্দে জন্ম নেয়া প্রখ্যাত আলিম-ফকীহ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল হামীদ আস-আসমান্দী (জ. ৪৮৮ হি.-মৃ. ৫৫২ হি.) রচিত গ্রন্থটিতে তিনি মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলাগুলো একত্র করেছেন। অতঃপর তিনি প্রতিটি মাসআলার ক্ষেত্রে হানাফী মত উল্লেখ করেছেন। তারপর সেসব মতের পক্ষে দলীল পেশ করেছেন। প্রথমে বিরোধী মতসমূহ দলীল সহ উল্লেখ করে পরে সেগুলো খণ্ডন করেছেন।[৪৪]

---

৪৩. ইয়াসিন দারাদাকাহ কর্তৃক তাহকীককৃত এ গ্রন্থটি আট খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

৪৪. এক খণ্ডে প্রকাশিত এ গ্রন্থটি তাহকীক করেছেন মুহাম্মাদ যাকী আব্দুল বার।

৩. আল-ইফসাহ, আন মা'আনিস সিহ্হাহ্ (الافصاح عن معاني الصحاح)

এ গ্রন্থটি লিখেছেন আবুল মুযাফফার আল-ওযীর আওনুদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হুবায়বান আল-হাম্বালী (জ. ৪৯৯ হি.-মৃ. ৫৬০ হি.)। এ গ্রন্থটি মূলত সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ের বৃহৎ ব্যাখ্যাগ্রন্থ। তবে লেখক এটিকে ফিকহী অধ্যায় বিন্যাসের ধারাবাহিকতা অনুসারে ফিকহী বিধি-বিধানসমূহ দুই খণ্ডে সংকলন করেছেন। লেখক এ গ্রন্থে প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের ঐকমত্যপূর্ণ ও মতানৈকপূর্ণ মাসআলাসমূহ উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থটি আল-ফিকহুল মুকারান-এর একটি অতি সূক্ষ্ম গ্রন্থ। যাতে মাযহাবসমূহ থেকে বিশুদ্ধ নির্ভরযোগ্য ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মতগুলো সংকলন করা হয়েছে। প্রতিটি মাসআলা সংক্ষেপে বর্ণনা করে এ ব্যাপারে প্রথমে প্রসিদ্ধ চার ইমামের মতৈক্যপূর্ণ মতসমূহ ও পরে মতানৈক্যপূর্ণ মতসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি আরো লিখেছেন আল-ইশরাফ আলা মাযাহিবিল আশরাফ (الإشراف على مذاهب الأشراف) নামক বিখ্যাত গ্রন্থ।

৪. বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ (بداية المجتهد ونهاية المقتصد)

এ গ্রন্থটি হলো তুলনামূলক ফিকহের ওপর লেখা অন্যমত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন রুশদ আল-কুরতুবী (জ. ৫২০ হি.-মৃ. ৫৯৫ হি.)[৪৫] এ বিখ্যাত গ্রন্থটি লিখেছেন। তুলনামূলক ফিকহের বিষয়ে লেখা এ গ্রন্থটি ফিকহী পদ্ধতিতে অধ্যায় বিন্যাস করে লিখিত হয়েছে। এ গ্রন্থটিতে লেখক সর্বপ্রথম শরয়ী মাসআলার যেগুলোতে ফকীহগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন সেগুলো, তারপর ঐসব মাসআলা যেগুলোতে তারা মতবিরোধ করেছেন সেগুলো সংক্ষেপে দলীলসহ উল্লেখ করেছেন। লেখক গ্রন্থের শুরুতেই পাঠকদেরকে মতবিরোধের কারণগুলো থেকে সতর্ক করেছেন।

অতঃপর লেখক তাঁর গ্রন্থে বর্ণিত প্রতিটি মাসআলার ক্ষেত্রে মতবিরোধের কারণ এবং ফিকহী মূলনীতি ও সূত্র অনুযায়ী তা বিশ্লেষণ করেছেন। লেখক প্রত্যেক মাযহাবের মত উল্লেখ করে ফিকহী ও উসূলী পদ্ধতি অনুসরণ করে দলীল পেশ ও ক্রটি চিহ্নিত করণের মাধ্যমে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি বিশ্বের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট ও কলেজে আল-ফিকহুল মুকারান বিষয়ের পাঠ্য।[৪৬]

---

৪৫. যিনি সংক্ষেপে ইবন রুশদ আল-হাফীদ নামে পরিচিত।

৪৬. অনেক প্রকাশনী দুই খণ্ডে এটি প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে অন্যতম হলো মিসরের মাতবা'আহ মুসতাফা আল-বাকী আল-হালবী থেকে ১৩৯৫ হি., ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত চতুর্থ

উপর্যুক্ত গ্রন্থাবলি ছাড়াও এ বিষয়ে লেখা আরো কিছু গ্রন্থ হলো, আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আন-বাতনিইউসী (মৃ. ৫২১ হি.) প্রণীত আল-ইনসাফ ফীত-তানবীহ। আলা আসবাবিল খিলাফ (الانصاف فى التنبيه على الاسباب الخلاف), আল্লামা নাসাফী (মৃ. ৫৩৭ হি.) প্রণীত আল-মানযুমাহ (المنظومة), আল্লামা উমর ইবনু মাহমুদ আয-যামাখশারী (মৃ. ৫৩৮ হি.) প্রণীত রুউসুল মাসায়িল (رؤوس المسائل), আবু বকর ইবনুল আরাবী (মৃ. ৫৪৩ হি.) প্রণীত আহকামুল কুরআন (احكام القران), আলাউদ্দীন আস-সামারকান্দী (মৃ. ৫৫২ হি.) প্রণীত মুখতালাফুর রিওয়ায়াহ (مختلف الرواية), আবুল হাসান ইয়াহইয়া ইবনু আবিল খাইর ইবনু সালিম আল-উমরানী আল-ইয়ামানী আশ-শাফিঈ (মৃ. ৫৫৮ হি.) প্রণীত আল-বায়ানু ফী মাযহাবিল ইমাম আশ-শাফিঈ (البيان فى مذهب الامام الشافعى), আস-সারাখসী আল-হানাফী (মৃ. ৫৭১ হি.) প্রণীত আত-তারীকাতুর রাযাভিয়্যাহ (الطريقة الرضوية), আল্লামা কাসানী (মৃ. ৫৮৭ হি.) প্রণীত বাদাইউস সানাঈ ফী তারতীবিশ শারা'ঈ (بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع), ইবনুদ দাহহান (মৃ. ৫৯২ হি.) প্রণীত তাকভীমুন নাযর (تقويم النظر) ইত্যাদি।

হিজরী ৭ম শতাব্দী

আল-ফিকহুল মুকারান-এর উৎপত্তির পর থেকে এ শতাব্দী পর্যন্ত এ বিষয়ে প্রচুর গ্রন্থ রচিত হলেও সত্যিকার অর্থে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কোনটি সে বিতর্কের কোন কুল-কিনারা পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, এ শতাব্দীতেই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থটি প্রণীত হয়েছে। নিম্নে এ শতাব্দীতে লেখা অন্যতম শ্রেষ্ঠ দু'টি গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. আল-মুগনী (المغنى)

আবূ মুহাম্মাদ মুয়াফ্‌ফাকুদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন কুদামা আল মাকদিসী[৪৭] (জ. ৫১৪ হি./ ১১৪৭ খ্রি.- মৃ. ৬২০ হি./ ১২২৩ খ্রি.) আল-ফিকহুল মুকারান-এর ওপর এ বিখ্যাত গ্রন্থটি লিখেছেন। এটি মূলত আবুল কাসিম উমার ইবনুল হুসাইন আল খারকী (মৃ. ৩৩৪ হি.) লিখিত আল মুখতাসার (المختصر) গ্রন্থের ওপর লেখা ভাষ্যগ্রন্থ। গ্রন্থটি হাম্বালী মাযহাবের এবং আল-ফিকহুল মুকারান-এর ওপর লেখা একটি বৃহৎ ফিকহী বিশ্বকোষ। লেখক এ গ্রন্থে শুধু চার মাযহাবের মতামতের

সংস্করণ। এরপর অধ্যাপক মাজিদ আল-হামাভী কর্তৃক তাহকীক করা কপি বৈরূতের দারু ইবন হাযম থেকে ১৪১৬ হি./ ১৯৯৫ সালে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

৪৭. যিনি ইবন কুদামা নামেই পরিচিত ও প্রসিদ্ধ।

তুলনাই করেননি বরং তিনি বিলুপ্ত অন্যান্য মাযহাবের মতামতের মধ্যেও তুলনা করেছেন। তিনি এ গ্রন্থে সাহাবা, তাবিঈ ও বিভিন্ন দেশের প্রসিদ্ধ আলিমগণের মতামত বর্ণনা করেছেন। তারপর তাঁদের মতের পক্ষের দলীলসমূহ উল্লেখ করে আলোচনা পর্যালোচনা করে যে মতটি দলীলের ভিত্তিতে শক্তিশালী সাব্যস্ত হয়েছে সেটিকে অগ্রাধিকার (তারজীহ) দিয়েছেন।

২. আল-মাজমূ' শারহ আল-মুহায্যাব (المجموع شرح المهذب)
গ্রন্থটি[৪৮] লিখেছেন ইমাম আবূ যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইবন্ শারফ আন-নাওয়াভী রহ. (মৃ. ৬৭৬ হি.)। এ গ্রন্থটিকে আল-ফিকহুল মুকারান-এর ওপর লেখা সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইমাম আন-নাওয়াভী শাফিয়ী মাযহাব-এর ওপর এ গ্রন্থটি লিখলেও এতে তিনি শুধু ঐ মাযহাবের মতামতই উল্লেখ করেননি; তিনি এতে প্রত্যেক ফিকহী মাসআলায় অন্যান্য ফিকহী মাযহাবের মতামত তাদের দলীলসহ উল্লেখ করেছেন। তারপর তিনি বিভিন্ন মাযহাবের দুর্বল (যয়ীফ) মত ও দলীলের বিপরীতে শক্তিশালী বিশুদ্ধ মত ও দলীল উপস্থাপন করেছেন। এমনকি তিনি বহু মাসআলায় তাঁর নিজ মাযহাবের[৪৯] মূল ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর মতেরও বিরোধিতা করেছেন। সবশেষে তিনি সহীহ দলীলের ভিত্তিতে মজবুত মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

শায়খ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (জ. ১৯১৪ খ্রি.- মৃ. ১৯৯৯ খ্রি.) এই গ্রন্থটি সম্পর্কে বলেন,

> وكتابه المجموع شرح المهذب من أنفع الكتب المطولة في الفقه المقارن عندي، مع تخريج الأحاديث وتمييز صحيحها من سقيمها
>
> আমার মতে তার (ইমাম আন-নাওয়াভীর) আল-মাজমূ' শারহ আল-মুহায্যাব গ্রন্থটি আল-ফিকহুল মুকারান-এর ওপর লেখা বড় গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাধিক উপকারী অন্যতম গ্রন্থ; কারণ এতে হাদীসসমূহের তাখরীজ ও দুর্বল থেকে সহীহকে পৃথক করা হয়েছে।[৫০]

তার এ বিষয়ের ওপর লেখা আরেকটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হলো, শারহু সহীহ মুসলিম (شرح صحيح مسلم)। এ গ্রন্থটি মূলত ইমাম মুসলিম সংকলিত 'আস-সহীহ' নামক হাদীস গ্রন্থটির ব্যাখ্যা।

---

৪৮. লেবাননের রাজধানী বৈরূতের দারুল ফিকর থেকে ২০ খণ্ডে প্রকাশিত।

৪৯. তিনি কোন নির্দিষ্ট ফিকহী মাযহাব-এর মুকাল্লিদ ছিলেন না।

৫০. নু'মান ইবন্ আল-মুফাস্সার (মাহমূদ আল-আলূসী), *আল-আয়াত আল-বায়্যিনাত ফী 'আদামি সিমা'ঈল আমওয়াত 'ইনদাল হানাফিয়্যাতিস সাদাত*, তা'লীক : মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মাআ'রিফ, ১৪২৫ হি./২০০৫ খ্রি., পৃ. ৯৫

উপর্যুক্ত গ্রন্থাবলী ছাড়াও এ শতাব্দীতে আল-ফিকহুল মুকারান-এর ওপরে একাধিক গ্রন্থ লেখা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো, আবুল মানাকিব শিহাবুদ্দীন ইবনু আহমাদ আয-যিনজানী (মৃ. ৬৫৬ হি.) প্রণীত তাখরীজুল উসূল 'আলাল ফুরূ (تخريج الاصول على الفروع), ইমাম কুরতুবী (মৃ. ৬৭১ হি.) লিখিত তাফসীর গ্রন্থ আল-জামি লি আহকামিল কুরআন (الجامع لاحكام القران) ইত্যাদি।

পর্যালোচনা

উপরোক্ত আলোচনায় হিজরী ২য় শতাব্দী থেকে ৭ম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তুলনামূলক ফিক্‌হ বিষয়ে লিখিত প্রায় সকল বিখ্যাত গ্রন্থের নাম আলেচিত হয়েছে। এ আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, এ বিষয়টি সম্পূর্ণ নতুন কোন বিষয় বা শাস্ত্র নয়; বরং এটি ইসলামের সর্বোত্তম যুগ থেকে ভিন্ন নামে চলে আসা শাস্ত্রের নবতর, সুসংঘবদ্ধ ও পদ্ধতিগতভাবে উপস্থাপিত শাস্ত্র। এ আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, কুরআনের তাফসীর এবং হাদীসের ভাষ্যগ্রন্থসমূহকে এখানে কম গুরুত্ব দিয়ে শুধু ফিকহী গ্রন্থগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কুরআনের তাফসীর এবং হাদীসের ভাষ্যগ্রন্থসমূহের মধ্যে এমন অনেক গ্রন্থ রয়েছে যেগুলোতে স্বতন্ত্র অনেক ফিকহী গ্রন্থের চেয়ে অধিক সুন্দরভাবে ও পদ্ধতিগতভাবে বিভিন্ন ফিকহের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে। যেমন ইমাম কুরতুবী (মৃ. ৬৭১ হি.) লিখিত তাফসীর গ্রন্থ আল-জামি লি আহকামিল কুরআন; যেটি তাফসীরে কুরতুবী নামে পরিচিত এবং ইমাম তাহাবী লিখিত শারহে মাআনিল আছার ইত্যাদি। এ প্রবন্ধে উল্লিখিত সময়কালে লিখিত এ বিষয়ের সকল গ্রন্থের তালিকা এখানে দেয়া হয়নি। তাছাড়া বর্ণিত গ্রন্থাবলির মধ্যে বেশ কয়েকটি গ্রন্থের কোন কপি আমাদের হাতে না পৌঁছায় সেগুলো সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য জানা সম্ভব হয়নি। যেগুলোর কপি পাওয়া গিয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যকের আকার অনেক বড় হওয়ায় সবিস্তারে সবগুলো গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি।

শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কোনটি ?

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যে গ্রন্থসমূহ অত্র প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কোনটি ? এই প্রশ্নের উত্তরে একটি গ্রন্থের নাম বলা কঠিন হলেও শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে প্রথম কাতারে থাকার মত গ্রন্থ হলো ইবন হাযম আল-আন্দালুসী'র আল মুহাল্লা (المحلى), ইবন রুশদ আল-কুরতুবী'র বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ (بداية المجتهد ونهاية المقتصد), ইবন কুদামা আল-মাকদিসী'র আল-মুগনী (المغنى), ইমাম আন-নাওয়াভী'র আল-মাজমূ' শারহিল আল-মুহায্‌যাব (المجموع شرح المهذب)।

উপসংহার

ইমামগণের প্রদত্ত ফিকহি মাসআলাসমূহকে একত্র করে নির্দিষ্ট মূলনীতি ও পদ্ধতির ভিত্তিতে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে কোন একটি মতকে অগ্রাধিকার প্রদানের এই শাস্ত্রের বিকাশ আধুনিক কালে খুবই লক্ষণীয় ও প্রণিধানযোগ্য। এর মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের প্রতি অন্ধ অনুকরণ ও পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগ থেকে মুক্তি লাভ করে কুরআন-সুন্নাহ সরাসরি অনুসরণের দাবি করা যায়। এ শাস্ত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে বিরাজমান ফিকহী মতপার্থক্য হ্রাস পাবে এবং একে অপরের কাছাকাছি আসার সুযোগ তৈরি হবে।

প্রায় সমগ্র বিশ্বেই এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে চর্চা হচ্ছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ের ওপর পৃথক অনুষদ, বিভাগ ও কোর্স চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশেও প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় পর্যয়ে এর চর্চা শুরু হয়েছে। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে ক্রমশ এর চর্চা ও গবেষণা বৃদ্ধি করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষাদান ও গবেষণার জন্যে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও পারদর্শী শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করতে হবে।

এ শাস্ত্রের ওপর লিখিত গ্রন্থাবলির যে তালিকা অত্র প্রবন্ধে প্রদত্ত হলো তা খুবই সংক্ষিপ্ত। এ বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ইমামদের এবং ফকীহদের মতবিরোধ মূলত মৌলিক বিষয়ে ছিলনা। পার্থক্য ছিল অমৌলিক বিষয়ে এবং বিশ্লেষণে। আশা করি এ সমস্ত পার্থক্য আলোচনার মাধ্যমে (বিশেষ করে ওআইসি (OIC) এর ফিকহ্ কমিটির উদ্যোগে) কমে আসবে।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৩৯
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১৪

খলীফা উসমান রা.-এর বিচারব্যবস্থা ও ফিকহী ইজতিহাদ : একটি পর্যালোচনা

রাশীদাহ্*

[**সারসংক্ষেপ :** *উসমান রা. এর খিলাফাতকালের ইসলামী রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থা ও ফিকহী ইজতিহাদ আধুনিক কালের অনেক বিচারিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তাই আলোচ্য প্রবন্ধে তৃতীয় খলীফা উসমান ইবন আফফান রা. এর বিচার ব্যবস্থা ও ফিকহী ইজতিহাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। অত্র প্রবন্ধে উসমান রা. এর বিচার ব্যবস্থার সামগ্রিক দিক আলোচনা করা হয়নি। তার ফিকহী ইজতিহাদ গুলোরও সবগুলো এখানে আলোচিত হয়নি। এখানে তার বিচার ব্যবস্থা ও ফিকহী ইজতিহাদের কিছু দৃষ্টান্ত মাত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। তার ইজতিহাদের মধ্যে কোন ভুল থাকলে তা ইজতিহাদী ভুল হিসেবে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে তৎপরবর্তীকালে তার ইজতিহাদ ভুল প্রমাণিত হলেও তা তার সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করতে হবে। আধুনিক বিচার ব্যবস্থাকে ইসলামী করণে ও নতুন নতুন ফিকহী সমস্যা সমাধানে উসমান রা. এর মতামত খুবই গুরুত্ব বহন করবে। অত্র প্রবন্ধে তার বুদ্ধিমত্তা, পরামর্শের আগ্রহ, কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের গভীরতা ও বিচক্ষণতা ফুটে উঠেছে। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, তিনি খুলাফায়ে রাশিদার অন্যতম খলীফা হয়ে সংকটকালে দীর্ঘ এক যুগ সফলভাবে শাসন ও বিচার পরিচালনা করেছেন। এ প্রবন্ধে মূলত তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, বিচার ব্যবস্থা, বিচারিক নযীর, বিবাহ, তালাক, ব্যবসা-বাণিজ্য, ইবাদাত ইত্যাদি বিষয়ে তার ইজতিহাদ সংক্ষেপে পেশ করা হয়েছে।]*

ভূমিকা

উসমান রা. ছিলেন খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে তৃতীয় খলীফা। 'আস-সাবিকুনাল আওয়ালূন' বা প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারী,[১] 'আশারায়ে মুবাশ্শারা' বা জান্নাতের

---

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ (সেনারক), আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, ঢাকা ক্যাম্পাস।

১. আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল আছীর, *উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা*, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৯৮৯, খ. ৩, পৃ. ৪৮১

সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর একজন[২] এবং সেই ছ'জন শ্রেষ্ঠ সাহাবীর মধ্যে গণ্য যাঁদের প্রতি রাসূল সা. আমরণ খুশী ছিলেন।[৩] উসমান রা. বলেন : "আমি প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী চারজনের মধ্যে চতুর্থ।"[৪] রাসূলুল্লাহ সা. ইসলামী রাষ্ট্রের যে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, খুলাফায়ে রাশেদীন হচ্ছেন সেই রাষ্ট্রের আদর্শ ও যোগ্য উত্তরসূরী। 'আদল, তাকওয়া, দিয়ানাত এবং ইহসানে তাঁরা ছিলেন সমুজ্জ্বল। তাঁদের মধ্যে এই অনুভূতি সদা জাগ্রত ছিল যে, এই পৃথিবীতে তাঁদের আগমন ইসলামের ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখা ও মানব জাতির মধ্যে সমতা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য। এখানে তাঁদেরকে খিলাফতে ইলাহিয়ার আমীন বা দায়িত্বশীল রূপে আল্লাহর উদ্দেশ্য পূরণ করতে হবে। পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা তাঁদের মধ্যে এমন পরিচ্ছন্ন হৃদয় ও ন্যায়ের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছিল যে, তাঁরা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও নিজেদের সন্তান আত্মীয়-বন্ধুদের শর'য়ী বিধানের শাস্তি থেকে বাঁচাতে চেষ্টাও করেননি।

উসমান রা.-এর জীবন পরিক্রমা

তাঁর পূর্ণ নাম উসমান ইব্‌ন আফফান ইব্‌ন আবিল-আস ইব্‌ন উমাইয়্যা ইব্‌ন আব্দে শামস ইব্‌ন আব্দে মানাফ। তাঁর বংশধারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর বংশ আব্দ মানাফের সাথে যুক্ত হয়েছে।[৫] উসমান রা.-এর মা আরওয়া বিন্‌ত কুরাইয ইব্‌ন রাবিআ ইব্‌ন হাবিব ইব্‌ন আব্দে শামস ইবন ইব্‌ন আব্দে মানাফ ইবন কুসাঈ। তাঁর মায়ের মা (নানী) উম্মে হাকিম আল-বাঈদা বিনতে আব্দিল মুত্তালিব, যিনি রাসূলুল্লাহ সা.-এর পিতা আব্দুল্লাহর আপন বোন।[৬] রাসূলুল্লাহ সা.-এর পিতা এবং উসমান রা.-এর নানী জময ভাই-বোন ছিলেন।[৭]

---

২. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ...عثمان في الجنة.
ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : মানাকিব, পরিচ্ছেদ : মানাকিবু আব্দুর রহমান ইবন আওফ, বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, হাদীস নং : ৩৭৪৭, ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি সহীহ।

৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার (বি. আই. সি.) ১ম সং, ১৯৮৯, খ. ১, পৃ. ৩৯

৪. إِنِّي لَرَابِعُ أَرْبَعَةٍ فِي الإِسْلَامِ আল-মুহিব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদ আন-নাদিরা ফী মানাকিব আল-'আশারা*, আল-মাকতাবাতুশ-শামেলাহ, খ. ১, পৃ. ২১২; ইবনুল আছীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৪৮১

৫. ইবনুল আছীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৪৮

৬. 'শিহাবুদ্দীন ইবন হাজার আল-আসকালানী, *আল-ইসাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা*, তাহকীক : আলী মুহাম্মদ আল-বাজাভী, বৈরূত : দারুল জীল, ১ম সং, ১৪১২ হি., খ. ৪, পৃ. ৪৫৬

৭. আলী মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আস-সাল্লাবী, *সীরাতু উসমান ইবন আফ্‌ফান রা.*, আল-মাকতাবাতুশ-শামেলাহ, পৃ. ১২

উসমান রা.-এর উপাধি ছিল জুন-নুরাঈন। উসমান রা.-কে জুন-নুরাঈন বলার কারণ হলো, তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহ সা.-এর দুই কন্যা রুকাইয়্যা ও উম্মে কুলসুমকে বিবাহ করেছিলেন।[৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি প্রত্যেক রাত্রে নামাযে দীর্ঘ সূরা তেলাওয়াত করতেন সেজন্য তাঁকে জুন-নুরাঈন বলা হয়। কেননা কুরআন একটি আলো এবং কিয়ামুল লাইল আরেকটি আলো।[৯]
তাঁর জন্মসন নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। সঠিক বর্ণনা হলো তিনি হস্তী বাহিনীর মক্কা আক্রমণের ছয় বছর পর মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।[১০] এ হিসেব অনুযায়ী তিনি রাসূলুল্লাহ সা. থেকে পাঁচ বছরের ছোট ছিলেন।

কুরাইশদের সম্মানিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চাচা হাকাম ইবন আবিল 'আস তাঁকে রশি দিয়ে বেঁধে বেদম মার দিত। কিন্তু এতে উসমান রা.-এর ঈমান একটু টলেনি। তিনি বলতেন : "তোমাদের যা ইচ্ছা করো, এ দ্বীন আমি কখনো ছাড়তে পারবো না।"[১১]

নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে মক্কার মুশরিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যে দলটি হাবশায় হিজরত করেছিল তাঁদের মধ্যে উসমান ও তাঁর স্ত্রী রুকাইয়্যাও ছিলেন।[১২] একমাত্র বদর[১৩] ছাড়া সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন।[১৪] রুকাইয়্যার মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ সা. রুকাইয়্যার ছোট বোন উম্মু কুলসুমকে উসমান রা.-এর সাথে বিয়ে দেন। কিন্তু কিছুদিন পর উম্মু কুলসুমও মারা যান। উম্মু কুলসুমের মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ সা. বলেন : "আমার যদি তৃতীয় কোন মেয়ে থাকতো তাকেও আমি উসমানের সাথে বিয়ে দিতাম।"[১৫] উসমান রা. দ্বিতীয় খলীফা উমার রা.-এর শাহাদাতের পর হিজরী ২৪ সালের ১লা মুহাররম খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[১৬] হিজরী ৩৫ সনের ১৮ই জিলহজ্জ শাহাদাত বরণ করেন।[১৭]

---

৮. জালালুদ্দিন আব্দুর রহমান আস-সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, আল-মাকতাবাতুশ-শামেলাহ, খ. ১, পৃ. ৬০
৯. আস-সাল্লাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২
১০. আল-আসকালানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৪৫৬
১১. মুহাম্মাদ ইবন সাদ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, বৈরূত : দারু সাদির, ১ম সং, ১৯৬৮, খ. ৩, পৃ. ৫৫
১২. *প্রাগুক্ত*
১৩. বদর যুদ্ধেও তিনি রওয়ানা হন। পরে রাসূলুল্লাহ সা.-এর নির্দেশে অসুস্থ স্ত্রীর সেবার জন্য মদীনায় থেকে যান। বদরের বিজয়ের খবর যেদিন মদীনায় এসে পৌঁছে সেদিনই তাঁর স্ত্রী রুকাইয়্যা মৃত্যুবরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর জন্য বদরের যোদ্ধাদের মত সওয়াব ও গনীমতের অংশ ঘোষণা করেন। মুহাম্মাদ ইবন সাদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫৬
১৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪১
১৫. " لو أن لنا ثالثة لزوجنا عثمان لها " ইবনুল আছীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৪৮১
১৬. ইবন সা'দ, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৬৩
১৭. আল-আসকালানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৪৫৮

বিচার ব্যবস্থা

রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর সময় শরী'আতের বিভিন্ন বিষয়ের যে সমস্ত সমাধান স্পষ্টভাবে উম্মাহর সামনে এসেছিল সত্যাশ্রয়ী খলীফাগণ তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এক্ষেত্রে আবু বকর ও উমার রা.-এর পরেই উসমান রা.-এর স্থান। তদুপরি তিনি বুদ্ধি-বিবেক ও কিয়াসের ভিত্তিতেও অনেক সমস্যার সমাধান বের করেছিলেন। তাঁর সময়ের বিচার ব্যবস্থা ও ফিক্হি ইজতিহাদ থেকে ইসলামী আইনের অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও সমসাময়িক সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়। নিম্নে উসমান রা.-এর বিচার ব্যবস্থা ও ফিক্হি ইজতিহাদের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

বিচারক কর্তৃক রায় ঘোষণার আগে যাচাই-বাছাই করা

উসমান রা. খলীফা হলে মদীনার বিচারক ছিলেন আলী ইব্ন আবী তালিব, যায়েদ ইব্ন সাবিত এবং আস-সায়ীব ইব্ন ইয়াযীদ রা.। গবেষকগণ বলেন, বিচারকগণ কর্তৃক ঘোষিত রায় তিনি নিজে যাচাই-বাছাই না করে অথবা অন্য বিশেষজ্ঞ সাহাবীগণের মতামত ছাড়া পাস করতেন না। এর অর্থ এই নয় যে, উসমান রা. বিচারকগণের উপর নির্ভর করতেন না বরং তাদেরকে সহযোগিতা করে আমীরের দায়িত্ব পালন করতেন।

তবে ইব্ন সা'দ বলেন, উসমান রা. সকল রায় নিজের নিকট আনতেন না। শুধু কঠিন বা দুর্বোধ্য বিচারগুলো নিজে মতামত দিতেন এবং বিখ্যাত সাহাবীগণের মতামত নিয়ে পাস করতেন। উদাহরণ : বায়হাকী তাঁর সুনানে এবং ওয়াকী' তাঁর গ্রন্থ আখবার আল-কুজাতে বলেন, আব্দুর রহমান ইব্ন সা'ঈদ বলেন, আমার দাদা আমাকে বলেন, আমি উসমান রা.-কে মসজিদে বসা দেখলাম, ইতিমধ্যে দুইজন অভিযোগকারী এসে অভিযোগ করলো। তখন তিনি একজনকে বললেন, যাও আলী রা.-কে ডেকে আন। অন্যজনকে বললেন, যাও তালহা ইবন উবাইদুল্লাহ, আয-যুবাইর এবং আব্দুর রহমানকে ডেকে আন। তাঁরা আসলো এবং উসমান রা.-এর পার্শ্বে বসলো। তখন তিনি অভিযোগকারী দুইজনকে ঘটনা বর্ণনা করতে বললেন। তাদের কথা শেষ হলে বিচারক তিনজনকে তিনি বললেন, বলো তোমাদের মতামত কি? বর্ণনাকারী বলেন, যদি তাঁদের মতামত তাঁর মতামতের সাথে মিলে যেত তাহলে তিনি তা কার্যকর করতেন। আর না মিললে তিনি পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন, তারপর রায় প্রকাশ করতেন।[১৮]

বিচারক নিয়োগ নীতিমালা

উসমান রা. মাঝে মাঝে বিভিন্ন প্রদেশে আলাদা বিচারক নিয়োগ করতেন। যেমন বসরাতে কা'ব ইবন সূর রা.-কে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেন। আবার কখনো

---

১৮. আস-সাল্লাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৭

কখনো বিচারকের দায়িত্ব গভর্নরকে দিতেন। যেমন কাব ইবন সূরের চাকুরী যাওয়ার পর গভর্নরকে বিচারকের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন। একইভাবে ইয়া'লা ইবন উমাইয়্যাকে সান'আ প্রদেশের গভর্নর ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেন। আবার কখনো কখনো বিচারপতি নিয়োগ গভর্নরদের উপর ছেড়ে দিতেন, যাতে তাঁরা তাদের পছন্দমত লোক নিয়োগ দিতে পারতেন।[১৯]

সর্বপ্রথম বিচারালয় (কোর্ট হাউস) প্রতিষ্ঠা

উসমান রা. সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি কোর্ট হাউস বা বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইতঃপূর্বের দুইজন খলীফা মসজিদে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। ঐতিহাসিক ইবনু আসাকির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আব্বাস রা.-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ সালিহ্ বলেন, একবার ইবনু 'আব্বাস রা. আমাকে উসমান রা.-কে দাওয়াত প্রদানের জন্য প্রেরণ করেন এবং আমি গিয়ে তাঁকে বিচারকের ঘরে পাই।[২০]

উসমান রা.-এর সময়ের প্রসিদ্ধ বিচারকগণের নাম

উসমান রা.-এর সময় যারা বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। তাদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত হলেন-

১. মদীনাতে যায়েদ ইব্‌ন সাবিত রা.
২. দামেশেকে আবুদ দারদা' রা.
৩. বসরাতে কা'ব ইব্‌ন সূর রা.
৪. এ ছাড়া বসরাতে আবু মূসা আল-আশআরী রা. গভর্নরের দায়িত্বের সাথে বিচারকের দায়িত্বও পালন করেন।
৫. কূফাতে শুরাইহ রহ.
৬. ইয়ামানে ইয়ালা ইব্‌ন উমাইয়্যা রা.
৭. সান'আতে ছুমামাহ রা.
৮. মিসরে উসমান ইব্‌ন কায়েস ইব্‌ন আবিল আস রা.।[২১]

উসমান রা.-এর বিচার ও কতিপয় ফিক্‌হী ইজতিহাদ

উসমান রা. কিসাস, হুদূদ, তাযীর, ইবাদত, মু'আমালাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে ফিকহী মতামত উপস্থাপনের মাধ্যমে ফিক্‌হ শাস্ত্রে অসামান্য অবদান রেখেছেন। নিম্নে এ রকম কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো :

---

১৯. আকরাম ইবন যিয়া আল-উমরী, *আসরুল খিলাফাতির রাশিদাহ*, আল-মাকতাবাতুশ-শামেলাহ, পৃ. ১৫৮

২০. আস-সাল্লাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৯

২১. আকরাম ইবন যিয়া আল-উমরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৪-১৭৫

উমার রা.-এর শাহাদাত ও এতদসংক্রান্ত কিসাসের ঘটনা

উমার রা.-এর শাহাদাতের পর তাঁর ছেলে উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমার রা. পিতার হত্যাকারী আবু লূ'লুওয়াহ'র কন্যা ও তার সহযোগী জুফাইনা নামক জনৈক খ্রিস্টান এবং তাসতুরের গভর্নর হরমুজানকে হত্যা করেন। উসমান রা. খিলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার পর সর্বপ্রথম এই বিচার তাঁর সামনে উপস্থাপন করা হয়। উসমান রা. বিচারের পক্ষে মতামত নেওয়া শুরু করেন। আলী রা. তাঁকে ছেড়ে না দিয়ে শাস্তি দেওয়ার পক্ষে মত দেন। কিছু মুহাজির সাহাবী বলেন, আপনি কিভাবে আজ তাকে হত্যা করতে পারেন? গতকাল যার পিতাকে হত্যা করা হয়েছে।

'আম্‌র ইব্‌নুল আস বলেন : হে আমীরুল মু'মিনীন! ঘটনাটি যেহেতু আপনার সময়ের নয় সেহেতু আল্লাহ হয়তো আপনাকে এ ব্যাপরে নিস্কৃতি দিয়েছেন। সুতরাং ঘটনাটিকে এভাবেই থাকতে দিন। এরপর তিনি নিজের সম্পদ থেকে উক্ত তিনজন নিহত ব্যক্তির দিয়াত (রক্তপণ) আদায় করেন। কিন্তু তাদের কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় রক্তপণের টাকা বায়তুল মালে জমা দেন এবং উবায়দুল্লাহকে মুক্ত করে দেন।[২২]

তাবারীর বর্ণনায় বলা হয়েছে, হরমুজানের ছেলে কামাজবান উবায়দুল্লাহকে ক্ষমা করে দেন। আবু মানসূর বর্ণনা করেন, পারস্যের লোকেরা মাদীনায় এসে লোকদের কাছে থাকতো। এ সুযোগে ফাইরুজ আমার পিতার নিকট গেল এবং দুই মাথাওয়ালা ছুরিটি নিল। তখন আমার পিতা (হরমুজান) বললেন, এটি দিয়ে কি করবে? লোকটি বললো, এটি থাকলে আমি নিরাপত্তা অনুভব করি। ছুরিটি নেওয়ার সময় আব্দুর রহমান ইব্‌ন আওফ এবং আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবু বকর রা. দেখে ফেলেন এবং উমার রা.-এর হত্যার পর তাঁরা ছুরিটি দেখে সাক্ষ্যদান করেন। অতঃপর উসমান রা. আমাকে প্রতিশোধের সুযোগ দিলে আমি উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমারকে ক্ষমা করে দেই।[২৩]

হত্যাকারীর কিসাস কার্যকর করা

ওয়ালিদ ইব্‌ন 'উকবাহ যখন কূফার গভর্নর, তখন কিছু সংখ্যক যুবক ইব্‌ন আল-হাইসামান আল-খুজায়ী-এর বাড়ী ভেঙ্গে ঘরে ঢোকে এবং তাদের কয়েকজনকে বের করে দেয়। তিনি তাদের সতর্ক করে খাপ থেকে তরবারী টেনে বের করলেন। কিন্তু তিনি তাদের সংখ্যা দেখে ভয়ে সাহায্যের জন্য তীব্র চিৎকার শুরু করলেন। চোরেরা তখন বললো, শান্ত হও। আমরা শুধু কিছু জিনিসপত্র নেব এবং আজ রাত্রেই তোমরা ভয় থেকে নিস্কৃতি পাবে। আবু শুরাইহ আল-খুযা'য়ী এসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন।

---

২২. ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, আল-মাকতাবাতুশ-শামেলাহ, খ. ৭, পৃ. ১৬৭

২৩. ইবন সাদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৩৫০-৩৫৫

এরপর ইব্‌ন আল-হাইসামান জোরে চিৎকার দিলে চোরেরা তাকে হত্যা করে। অতঃপর জনগণ তাদের ঘেরাও করে আটক করে। তাদের মধ্যে ছিল জুহাইর ইব্‌ন জুনদুব আল-আজদী, মুয়ায়রা ইব্‌ন আবি মুয়ায়রা আল-আসাদী, শুবাইল ইব্‌ন উবাঈ আল-আজদী এবং অন্যরা। আবু শুরাইহ ও তার ছেলে সাক্ষ্য দিল চোরেরা একত্রে তাদের উপর আক্রমণ করে এবং তাদের কয়েকজন ইব্‌ন আল-হাইসামানকে হত্যা করে। গভর্নর ওয়ালিদ ইব্‌ন উকবা ঘটনাটি উসমান রা.-এর নিকট লিখে পাঠান। অতঃপর খলীফা তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের নির্দেশ দিয়ে চিঠি লিখলে তিনি তা কার্যকর করেন।[২৪] এমনিভাবে একজন লোক অর্থের জন্য এক ব্যবসায়ীকে হত্যা করলে উসমান রা. তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন।[২৫]

অন্ধব্যক্তি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন সংক্রান্ত

একজন অন্ধ ব্যক্তি সাধারণত গাইড ছাড়া চলাফেরা করতে পারে না। কাউকে না দেখে হয়তো ক্ষতি করতে পারে। তবে এখানে প্রশ্ন হচ্ছে সে যদি না বুঝে তার গাইড বা সঙ্গীর ক্ষতি করে তাহলে সে দায়ী হবেনা। উসমান রা. বলেন :

مَنْ جَالَسَ أَعْمَى ، فَأَصَابَهُ الأَعْمَى بِشَيْءٍ ، فَهُوَ هَدَرٌ.

কোন ব্যক্তি যদি কোন অন্ধ ব্যক্তির সাথে কোথাও এক সাথে বসে এবং অন্ধব্যক্তি যদি তাকে কোন উপায়ে কোন ক্ষতি করে তাহলে সে এজন্য দায়ী হবেনা।[২৬]

দুই ব্যক্তির মধ্যে বিবাদের শাস্তি

দুজন ব্যক্তি যদি পরস্পর লড়াইয়ে রত হয়, তবে তারা উভয়েই অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে এবং এ সময় যদি দুজনেই ক্ষতবিক্ষত হয়, তা হলে কিসাসের মাধ্যমেই এর প্রতিবিধান করা হবে। এ বিষয়ে উসমান রা. বলেন :

إذا اقتتل المقتتلان فما كان بينهما من جراح فهو قصاص

যদি দুইজন ব্যক্তি লড়াইয়ে লিপ্ত হয় এবং তারা উভয়েই ক্ষতবিক্ষত হয়, তাহলে কিসাসের মাধ্যমে এর প্রতিবিধান করা হবে।[২৭]

---

২৪. আস-সাল্লাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮১-১৮২

২৫. আকরাম ইবন যিয়া আল-উমরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭

২৬. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, অধ্যায়- দিয়াত, পরিচ্ছেদঃ আল-মাকফূফ ইয়ুছীবু ইনসানান, হা.নংঃ ২৮৫৫৯

২৭. আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ*, অধ্যায়- আল-'উকুল, পরিচ্ছেদঃ আল-মুকতাতিলানি..., হা.নংঃ ১৮৩২১

প্রাণী হত্যার ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে

যদি কারোর কোন প্রাণী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে তার মূল্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে আদায় করতে হবে। উকবা ইব্‌ন 'আমির থেকে বর্ণিত আছে যে, উসমান রা.-এর খিলাফতের সময় জনৈক ব্যক্তির শিকারী কুকুর হত্যার বিচার নিয়ে আসলে তিনি তার মূল্য আটশ দিরহাম নির্ধারণ করে মূল্য পরিশোধের ফয়সালা দেন। অন্য একজনের একটি কুকুর হত্যার শাস্তি হিসেবে বিশটি উটের মূল্য ক্ষতিপূরণের সিদ্ধান্ত দেন।[২৮]

আত্মস্বীকৃত হত্যাকারীর তাওবা গ্রহণ প্রসঙ্গে

একজন লোক খলীফা উসমান রা.-এর কাছে এসে বললো, হে আমিরুল মু'মিনীন! আমি একজনকে হত্যা করেছি। আমার তাওবা কি গ্রহণ করা হবে? তখন তিনি নিম্নের আয়াতটি পড়লেন,

حم - تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ - غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ

হা-মীম-। কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা।[২৯]

অতঃপর তিনি তাকে বললেন : إعمل ولا تيأس! "ভালো কাজ করো এবং হতাশ হয়োনা।"[৩০]

মদপানের জন্য হদের শাস্তি প্রসঙ্গে

এটা সর্বজন বিদিত যে, রাসূল সা.-এর সময় স্বাধীন লোকের মদপানের শাস্তি ছিল চল্লিশটি বেত্রাঘাত এবং সেই সাথে জনগণ তাকে জুতা নিক্ষেপ করতো ও জামার কোণা ছিঁড়ে দিয়ে তিরস্কার করতো। আবু বকর রা.-এর শাসনামলেও এমন বিধানই ছিল। কিন্তু উমার রা.-এর শাসনামলের মধ্য সময়ে যখন দেখলেন যে, লোকেরা এই শাস্তিকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেনা, তখন তিনি সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করে মদপানের শাস্তি চল্লিশ বেত্রাঘাত থেকে আশিটিতে উন্নীত করেন। উসমান রা. কখনও চল্লিশটি দিয়েছেন কখনও আশিটিও দিয়েছেন। তবে কেউ ভুলবশত মদপান করলে তাকে কোন শাস্তি দেননি, তবে কেউ মদপানে আসক্ত হয়ে গেলে বা নেশাগ্রস্ত হলে তার ক্ষেত্রে শাস্তি প্রয়োগ করতেন। আর কেউ প্রথমবার মদপান করলে চল্লিশটি

---

২৮. আকরাম ইবন যিয়া আল-উমরী, *প্রাগুক্ত*

২৯. আল-কুরআন, ৪০ : ১-৩

৩০. ইমাম আবূ বকর আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, অধ্যায় : আন-নাফাকাত, পরিচ্ছেদ : আসলু তাহরীমিল কত্‌ল ফিল কুরআন, মক্কা : মাকতাবাতু দারিল বায, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি., হাদীস নং-১৫৬১২

বেত্রাঘাত আর আসক্ত হলে আশিটি বেত্রাঘাত দিতেন। প্রথম চল্লিশটি হচ্ছে হদ্ হিসেবে আর শেষ চল্লিশটি তা'যীর হিসেবে গণ্য করা হতো।[৩১] অর্থাৎ উসমান রা.-এর মতে, হদ্দের নির্ধারিত শাস্তি হচ্ছে চল্লিশটি বেত্রাঘাত।[৩২]

উসমান রা. বৈপিত্রেয় ভাইয়ের উপর হদ কার্যকরী করেন

হুছাইন ইবনুল মুনযির রা. বলেন, আমি উসমান ইব্ন আফফান রা.-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম, যখন তাঁর ভাই ওয়ালিদ ইব্ন উকবাকে নিয়ে আসা হলো। তখন দুইজন ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল। একজন ছিল হুমরান, সে সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, ওয়ালিদ মদপান করেছে। অন্য একজন সাক্ষ্য দিল যে, আমি তাকে বমি করতে দেখেছি। উসমান রা. বললেন, মদপান না করলে বমি করার কথা নয়। তখন তিনি আলী রা.-কে বললেন, তাকে চাবুক মারো। আলী রা. বললেন, হে হাসান! তুমি তাকে চাবুক মারো। তখন হাসান বললেন, যে শাস্তি দেয়ার জন্য নিযুক্ত বা দায়িত্বপ্রাপ্ত বিষয়টি তার উপর ছেড়ে দিন। তিনি তখন আব্দুল্লাহ ইব্ন জাফরকে বললেন, উঠ, চাবুক মার। ওয়ালিদ চাবুক মারতেছিলেন এবং আলী রা. গণনা করতেছিলেন। যখন সে চল্লিশটিতে পৌঁছাল তখন তিনি তাঁকে থামতে বললেন। অতঃপর তিনি বললেন, নাবী সা. ও আবূ বকর রা. চল্লিশটি করেই বেত্রাঘাত করেছিলেন। উমার রা. আশিটি করে মারতেন। এগুলো সবই সুন্নাহসম্মত কিন্তু আমার নিকট পছন্দনীয় হলো এটি যা আমি করলাম।[৩৩]

অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর চুরির বিচার

ইসলামী আইনানুযায়ী চুরির শাস্তির বিধান কার্যকর করতে হলে, চোরকে প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন এবং চুরি করা হারাম-এ বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হতে হবে। চুরির অপরাধে এক বালককে উসমান রা.-এর নিকট নিয়ে আসলে তিনি বলেন, তার গোপন অঙ্গের দিকে তাকাও, তখন তারা তাকিয়ে দেখলো যে, তার নাভীর নীচের চুল এখনও উঠেনি। সুতরাং তার হাত না কাটার নির্দেশ দিলেন।[৩৪]

---

৩১. আস-সাল্লাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৪

৩২. ইমাম মালিক ইবন আনাস, *মুয়াত্তা*, অধ্যায় : হুদূদ, পরিচ্ছেদ : আল-হাদ্দু ফীশ-শুরবি, দামেশক : দারুল কলাম, ১ম সং, ১৯৯১, খ. ৩, পৃ. ৮০

৩৩. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : হুদুদ, পরিচ্ছেদ : হাদ্দুল খমর, বৈরূত : দারুল জীল ও দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, হাদীস নং-৪৫৫৪

৩৪. عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : أُتِيَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَقَالَ : انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ فَنَظَرُوا فَلَمْ يَجِدُوهُ أَنْبَتَ الشَّعَرَ فَلَمْ يَقْطَعْهُ.

ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, অধ্যায় : হিজর, অনুচেছদ : আল-বুলুগু বিল-ইনবাত, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-১১১০৩

ব্যভিচারের শাস্তি

কোন নারী অথবা পুরুষ যদি ব্যভিচার করে এবং সে যদি স্বাধীন ও বিবাহিত হয় তাহলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। উসমান রা.-এর সময় একজন বিবাহিত নারী ব্যভিচার করলে তিনি তাকে পাথর মারার নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি পাথর মারার সময় উপস্থিত ছিলেন না।[৩৫]

পরোক্ষভাবে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সম্মানহানি করার শাস্তি

কোন ব্যক্তি যদি পরোক্ষভাবেও অন্যের সম্মানহানি হয় এমন অপবাদ দিতো উসমান রা. তাকে শাস্তি দিতেন। তাঁর আমলে একজন লোক অন্যজনকে বললো, يا ابن شامة الوذر-"হে তিলক-ফাটা দুর্গন্ধনীর বাচ্চা!" মূলত লোকটি এ বলে অপর ব্যক্তির মাকে ব্যভিচারিণী বলে অপবাদ দিতে চেয়েছিল। অপমানিত লোকটি উসমান রা.-এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি অভিযুক্ত লোকটি ডাকলেন। সে তার কথার বিভিন্ন উদ্দেশ্যের কথা বলে অপরাধ অস্বীকার করতে চাইলো। কিন্তু উসমান রা. সে তার কথার দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছে তার দিকে ভ্রুক্ষেপই করলেন না; অধিকন্তু তিনি তার ব্যাপারে বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিলেন[৩৬]

সাধারণ দণ্ড হিসেবে নির্বাসন দেয়া

উসমান রা. শুনলেন যে, কা'ব ইবনু যিল-হাবকাহ আল-নাহ্দী যাদু বিদ্যার সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং তিনি ওয়ালিদ ইব্‌ন উকবাকে জিজ্ঞাসা করতে বললেন যে, সে এটার সাথে সম্পৃক্ত কিনা? যদি থাকে তাহলে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। অতঃপর তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন এবং প্রশ্ন করলে সে বললো, এটা এক ধরনের চমক বা আনন্দ। এরপর বিষয়টি উসমান রা.-কে জানানো হলো। তখন খলীফা তাকে সিরিয়ায় নির্বাসিত করার নির্দেশ দিলেন।[৩৭]

ইবাদত ও লেন-দেনের ক্ষেত্রে উসমান রা.-এর মতামত

উসমান রা. আরাফাহ ও মিনাতে নামাযের ইমামতি করেন এবং চার রাকাত নামায পড়েন। কিছুলোক তখন আব্দুর রহমান ইব্‌ন আওফের নিকট গিয়ে বললেন, আপনি কি জানেন আপনার ভাই কি করেছেন? তিনি চার রাকাত নামায পড়িয়েছেন। অতঃপর আব্দুর রহমান ইব্‌ন আওফ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে দু'রাকাত নামায পড়লেন। এরপর উসমান রা.-এর নিকট গিয়ে প্রশ্ন করলেন "আপনি কি রাসূল সা.-এর সাথে

---

৩৫. আস-সাল্লাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৬

৩৬. *প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫-১৮৬*

৩৭. *প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬*

দু'রাকাত নামায পড়েননি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবার বললেন, আপনি কি আবু বকর রা.-এর সাথে দু'রাকাত নামায পড়েননি? বললেন, হ্যাঁ। আবার বললেন, আপনি কি উমার রা.-এর সাথে এখানে দু'রাকাত নামায পড়েননি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর উসমান রা. বললেন, হে আবূ মুহাম্মাদ! আপনি আমার কথা শুনুন। হজ্জে ইয়ামানের কিছু লোক এবং কিছু নতুন মুসলিম এসেছে তারা ফিরে গিয়ে তাদের নেতাদেরকে বলবে আবাসিক লোকদের জন্যও নামায দু'রাকা'আত। এতে বিভ্রান্তি ছড়াবে। তাই আমি চার রাক'আত পড়েছি। এছাড়া মক্কাতে আমার স্ত্রী রয়েছে, আর তায়েফে আমার সম্পদ রয়েছে। আমি হজ্জ শেষে মক্কায় স্ত্রীর নিকট থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।[৩৮] এরপর আব্দুর রহমান ইব্ন আওফ রা. ইব্ন মাসউদ রা.-এর নিকট গিয়ে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি খলীফার মতের সাথে দ্বিমত না করে নিজে চার রাকাত পড়ার কথা বললেন। পরে তিনি বললেন, আমিও চার রাকাত পড়বো।[৩৯]

উল্লেখ্য যে, উসমান রা. দূরদর্শিতা থেকেই এটা করেছিলেন। তাছাড়া অধিকাংশ সাহাবী তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছিলেন। তাই, এখানে শরী'আত লঙ্ঘিত হয়নি।

কিছু সংখ্যক সাহাবী মুসাফির অবস্থায় পুরো নামায পড়ার পক্ষে ছিলেন। যেমন, আয়েশা রা., উসমান রা., সালমান ফারসী রা. সহ প্রায় চৌদ্দ জন সাহাবী। উসমান রা. সফরে সালাত কছর করাকে ফরয মনে করতেন না। যেটা মদীনার ফকীহদের মত। যেমন-ইমাম মালিক, শাফিয়ীসহ অন্যরা।[৪০]

জুমু'আহর সলাতের দ্বিতীয় আযানের প্রচলন

তৃতীয় খলীফা উসমান রা.-এর সময় যখন মদীনার শহর বিস্তৃত হয় তখন লোকসংখ্যা বেড়ে গেলে নামায নিকটবর্তী হয়েছে জানিয়ে জনগণকে সতর্ক করার জন্য দ্বিতীয় আযান চালু করেন। তিনি ইজতিহাদ করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেন। এবং সাহাবীগণও তার সিদ্ধান্তের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন। তৎপরবর্তী কালে এই আমল প্রচলিত ছিল। তার পরবর্তী খলীফা আলী রা. মু'আবিয়া রা., বানী উমাইয়া ও বানী আব্বাস-এর শাসনামলেও কেউ এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেননি।

---

৩৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯০

৩৯. ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, অধ্যায় : সালাত, অনুচ্ছেদ : মান তারাকাল কসরা ফিস সালাত, *প্রাগুক্ত*

৪০. আব্দুর রহমান আল-জাযায়িরী, *আল-ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরব'আহ*, মিসর : দারুল গদীল জাদীদ, ১ম সংস্করণ, ২০০৫, পৃ. ২৬৬

ফলে মুসলিমদের ইজমার মাধ্যমে এটি বিধান হিসেবে সাব্যস্থ হয়ে গেল।[৪১] 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে এর কারণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে খুতবাহ শুরুর আগেই দ্বিতীয় আযান দেয়ার কারণ ছিল যাতে খুতবাহ শুনা থেকে কেউই বঞ্চিত না হয়।[৪২]

অপবিত্রতা অজানা অবস্থায় নামাযে ইমামতি করার বিধান

উসমান রা. ইসলাম গ্রহণের পর থেকে প্রত্যেকদিন গোসল করতেন। একদিন ফজরের নামাযের সময় তিনি জুনুব (নাপাক) অবস্থায় নামাযের ইমামতি করলেন। সকালে তিনি কাপড়ে অপবিত্রতা দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। আমি অপবিত্র ছিলাম। কিন্তু তা বুঝতে পারিনি। তারপর তিনি পবিত্র হয়ে পুনরায় নামায আদায় করলেন। কিন্তু তারা যার পিছনে নামায আদায় করেছিল তারা পুনরায় নামায পড়েননি।[৪৩]

মফস্বল ও দেহাতে জুমার নামায পড়ার নির্দেশ

লাইছ ইব্‌ন সাদ রহ. বলেন, প্রত্যেক শহর ও মফস্বলে যেখানেই জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে লোকদেরকে জুমু'আর সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়। উমার ও উসমান রা.-এর সময় তাঁদের নির্দেশে শহর ও মফস্বলের লোকেরা জুমু'আর নামায পড়তো এবং ঐ সময় তাঁদের মধ্যে অনেক সাহাবী ও ছিলেন।[৪৪]

তিলাওয়াতে সাজদার ব্যাপারে

উসমান রা.-এর মতে তিলাওয়াতে সাজদা ওয়াজিব, যখন সে কুরআন তেলাওয়াত করবে এবং কুরআন তেলাওয়াত শুনার জন্য বসবে। যে ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃতভাবে সাজদার আয়াত শুনলো তার জন্য সাজদাহ্ দেয়া ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ শুনার নিয়তে না বসলে কিংবা মনোযোগ দিয়ে না শুনলে সাজদা ওয়াজিব হবে না। যেমন সাজদার আয়াত তেলাওয়াতের সময় যদি কেউ পার্শ্ব দিয়ে যায় তার জন্য সাজদা ওয়াজিব নয়। উসমান রা. থেকে বর্ণিত যে, ঋতুমতী মহিলা সাজদার আয়াত শুনলে ইশরায় সাজদা দিবে কিন্তু নামাযের মত করে সাজদা দিবে না।[৪৫]

---

৪১. আস-সাল্লাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১

৪২. ইবন হাজার আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, বৈরূত : দারুল মা'আরিফা, ৩য় সং, খ. ১২, পৃ. ১৫১

৪৩. আস-সাল্লাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২

৪৪. শামসুল হক আযিমাবাদী, *আওনুল মা'বুদ*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, খ. ৮, পৃ. ৩৯২; ইবন হাজার আল-আসকালানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১২, পৃ. ১২৮

৪৫. আস-সাল্লাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২

জুম'আর খুতবার মাঝে উসমান রা. বিশ্রাম নিতেন

কাতাদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা., আবু বকর রা., উমর রা. এবং উসমান রা. জুম'আর খুতবা দাঁড়িয়ে দিতেন। বয়সের কারণে যখন উসমান রা.-এর জন্য দাঁড়ানো কষ্টকর হয়ে যায়, তখন তিনি প্রথমে দাঁড়িযে ও পড়ে বসে খুতবা দিতেন। মুআবিয়া রা. খলীফা হলে প্রথম খুতবা বসে দিতেন আর দ্বিতীয় খুতবা দাঁড়িয়ে দিতেন।[৪৬]

রুকূর পূর্বে কুনুত পড়া

আনাস রা. বলেন, উসমান রা. প্রথম ব্যক্তি যিনি নিয়মিত রুকূর পূর্বে কুনুত পড়তেন। যাতে করে মুসল্লীরা ঐ রাক'আত ধরতে পারে।[৪৭]

ইদ্দতকালীন সময়ে মহিলাদের হজ্জ ও ওমরাহ প্রসঙ্গে

এটা সর্বজনবিদিত যে, ইদ্দতকালীন সময়ে কোন মহিলা নিজের ঘরের বাইরে রাত্রি যাপন করতে পারবে না। আর ইদ্দতকালীন সময়ে রাত্রি যাপন করতে হয় এরকম দূরত্বে কোন সফর করতে পারবে না। হজ্জ ও ওমরার ক্ষেত্রে সফর ও রাত্রি যাপন বাধ্যতামূলক। উসমান রা. বলেন, ইদ্দতকালীন সময়ে হজ্জ ও ওমরাহ বাধ্যতামূলক নয়। যদি ইদ্দতকালীন সময়ে কোন মহিলা হজ্জ ও ওমরাহ করতে আসতো তাহলে উসমান রা. জুহফাহ অথবা যুল-হুলাইফাহ থেকে ফেরত পাঠাতেন।[৪৮]

হজ্জে তামাত্তু ও কিরান নিষিদ্ধ করেন

তামাত্তু ও কিরান হজ্জ করতে নিরুৎসাহিত করতেন

উসমান রা. তামাত্তু ও কিরান হজ্জ করতে নিরুৎসাহিত করতেন। উল্লেখ্য, ইফরাদ, তামাত্তু ও কিরান- এর তিন প্রকারের হজ্জের মধ্যে কোনটি উত্তম- এ বিষয়ে সাহাবীগণ বিভিন্ন মত পোষণ করতেন। উছমান রা.-এর নিকট ইফরাদই ছিল উত্তম ছিল। তবে তিনি কেউ তামাত্তু ও কিরান হজ্জ করলে তার নিন্দা করতেন না।[৪৯] মারওয়ান ইবনুল হাকাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উসমান রা.-কে কিরান ও তামাত্তু নিষেধ করতে দেখেছি। আর আলী রা. দুটোরই নিয়ত করতেন।[৫০]

---

৪৬. আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক আস-সান'আনী, *আল-মুসান্নাফ*, অধ্যায় : জুম'আ, পরিচ্ছেদ : আল-খুতবাতু কয়িমান, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় সং, ১৪০৩ হি., খ. ৩, পৃ. ১৮৭

৪৭. عن حميد عن أنس أن أول من جعل القنوت قبل الركوع أي دائما عثمان لكيدرك الناس الركعة
ইবন হাজার আল-আসকালানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১২, পৃ. ৩১৩

৪৮. আস-সাল্লাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৩

৪৯. *প্রাগুক্ত*, ১৯৩

৫০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : হজ্জ, পরিচ্ছেদ : আত-তামাত্তু, ওয়াল কিরানু ওয়াল ইফরাদ, বৈরূত : দারু ইবন কাছীর, ৩য় সং, ১৯৮৭

ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকারের গোশত খাওয়ার ব্যাপারে

আব্দুর রহমান ইব্‌ন হাতিব বলেন, আমি কিছু লোকসহ উসমান রা.-এর সাথে উমরাহ করছিলাম। যখন তিনি রাওয়াহাতে ছিলেন, তখন তারা খলীফার জন্য পাখির শিকারকৃত গোশত নিয়ে আসলো। তিনি সবাইকে খেতে বললেন, কিন্তু নিজে খেতে চাইলেন না। আমর ইব্‌নুল আস রা. বলেন, আপনি যা খেতে পারেন না তা কি আমরা খেতে পারি। উসমান রা. বললেন, আমি তোমাদের মত নই। এটা আমার জন্য ধরা হয়েছে এবং আমার সন্তুষ্টির জন্য হত্যা করা হয়েছে।[৫১]

নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ অপছন্দ করা

আল-খাল্লাল ইসহাক ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী তালহা তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবু বকর, উমার ও উসমান রা. নিকটাত্মীয়দের মাঝে বিবাহ অপছন্দ করতেন শুধুমাত্র সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার ভয়ে।[৫২]

দুধ ভাই ও বোনের বিবাহ বিচ্ছেদ

ইব্‌ন শিহাব বলেন, উসমান রা. একজন কালো মহিলার বর্ণনার ভিত্তিতে দুধ ভাই-বোনের বিয়ে বিচ্ছেদ করে দেন। কেননা মহিলা দুইজনকেই দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছিল।[৫৩]

খুলার ব্যাপারে

রুবাই বিন্‌ত মু'আওয়িয বলেন, আমার স্বামীর সাথে আমার তীব্র ঝগড়া-বিবাদ চলছিল। আমি তাকে বলেছিলাম, আমার সব সম্পদ আপনাকে দিয়ে দিব যদি আপনি আমাকে ছেড়ে (তালাক) দেন। সে বললো, আমি রাজি আছি। আল্লাহর শপথ! সে আমার সবকিছু নিয়েছিল এমনকি আমার বিছানাও। আমি উসমান রা.-এর নিকট ঘটনাটি বললে তিনি তার স্বামীকে বললেন, শর্তটি তাকে সকল অধিকার দিয়েছে, এমনকি তার মাথার খোপারও।[৫৪]

---

৫১. عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أنه اعتمر مع عثمان في ركب فلما كانوا بالروحاء قدم إليهم لحم طير قال عثمان كلوا وكره أن يأكل منه فقال عمرو بن العاص أنأكل مما لست منه آكلا قال إني لست في ذلكم مثلكم إنما صيدت لي وأميتت باسمي - أو قال من أجلي

আস-সানআনী, *আল-মুসান্নাফ*, অধ্যায় : মানাসিক, পরিচ্ছেদ : আল-মুহরিমু ইদতররু ইলা লাহমিল মাইতাতি আবিছ-ছয়দি, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৮৭

৫২. ইবন হাজার আল-আসকালানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২৫, পৃ. ২৮০

৫৩. আস-সাল্লাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৫

৫৪. ইবন হাজার আল-আসকালানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২৬, পৃ. ২৪২

বিধবার শোক পালন

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী স্বামীর গৃহেই রাত্রি যাপন করবে। তবে প্রয়োজনে দিনের বেলায় বাইরে যেতে পারবে। আবু সাঈদ আল-খুদরী রা.-এর বোন ফুরাইয়্যা বিনতে মালিক ইব্‌ন সিনান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল সা.-এর নিকট আসলেন এবং তাঁকে বললেন যে, কিছু লোক তাঁর স্বামীকে তারাফ আল-কাদূম নামক স্থানে হত্যা করে। আমি রাসূল স.-এর নিকট আমার পরিবারের নিকট ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। কারণ আমার স্বামী আমাকে তার নিজস্ব মালিকানার কোন বাড়িতে রেখে যাননি এবং আমার ভরণপোষণের ব্যবস্থাও রেখে যাননি। রাসূল সা. বললেন, ঠিক আছে। এমতাবস্থায় আমি ফিরে আসতে উদ্যত হলাম এবং পার্শ্বের কক্ষ পর্যন্ত গেলে তিনি আমাকে ডেকে পাঠান এবং পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বললে? আমি সব পুনরায় খুলে বললাম। সব শোনার পর তিনি ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত আমাকে আমার বাড়ীতে বসবাস করতে বলেন। সুতরাং আমি চার মাস দশ দিন পর্যন্ত ইদ্দত পালন করলাম। উসমান রা. খলীফা হলে এ বিষয়ে জানার জন্য আমাকেও ডেকে পাঠালেন। আমি সব খুলে বললে তিনি সে অনুযায়ী বিধান জারি করেন।[৫৫]

হিল্লা বিয়ে করতে নিষেধ

উসমান রা.-এর খিলাফতের সময় একদিন তিনি যখন বাহনে চড়ছিলেন তখন একজন লোক এসে বললো, হে আমিরুল মু'মিনীন! আমার কিছু প্রশ্ন আছে। উসমান রা. বললেন, আমি এখন খুব ব্যস্ত। কিন্তু তুমি যদি কোন প্রশ্ন করতে চাও তাহলে বাহনের পিছনে চড়ো। অতঃপর সে খলীফার পিছনে উঠলো এবং বললো, আমার একজন প্রতিবেশী আছে। সে রাগের মাথায় তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে এখন বিমর্ষ হয়ে পড়েছে। আমি তার স্ত্রীকে বিবাহ করতে চাই এবং পরে তাকে তালাক দিয়ে তার প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে যেতে দিতে চাই। উসমান রা. বললেন, لا تنكحها إلا نكاح رغبة.-"না, তাকে বিয়ে করো না। যদি তুমি সত্যিই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকো, তবেই তাকে বিয়ে করো।"[৫৬]

---

৫৫. আস-সানআনী, *আল-মুসান্নাফ*, অধ্যায় : তালাক, পরিচ্ছেদ : আইনা তা'তাদ্দুল মুতাওয়াফ্ফি আনহা, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ৩২

৫৬. ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, অধ্যায় : নিকাহ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী নিকাহিল মুহাল্লালি, *প্রাগুক্ত*

মাদকসেবীর তালাক প্রদান সম্পর্কে

উসমান রা.-এর মতে, মাতাল ব্যক্তির চুক্তি, ওয়াদা, স্বীকারোক্তি কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়।[৫৭] কারণ যে জানেনা সে কী বলছে। তিনি আরো বলেন, ليس لسكران ولا مجنون طلاق-"মাতাল ও পাগলের তালাক কার্যকর হবে না।[৫৮]

কোন নির্বোধ ব্যক্তিকে সম্পদ হস্তান্তরের জন্য ছেড়ে না দেয়া

উসমান রা.-এর মত ছিল কোন নির্বোধ মানুষকে তার নিজের সম্পদ হস্তান্তরের জন্য অনুমতি দেয়া যাবে না। ঘটনাটি ছিল এমন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন জা'ফার ষাট হাজার দিনার দিয়ে কিছু অনুর্বর জমি কিনলে এ খবর আলী রা.-এর নিকট পৌঁছালে তিনি বলেন, এই জমির এত অধিক দাম হতে পারে না এবং আব্দুল্লাহ বিন জাফর চরমভাবে প্রতারিত হয়েছেন। আলী রা. আব্দুল্লাহ বিন জাফরকে নিয়ে উসমান রা.-এর নিকট গিয়ে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করে সম্পদ হস্তান্তর না করার জন্য নির্দেশ চাইলেন।

আব্দুল্লাহ ইবন জাফর তখন বিখ্যাত ব্যবসায়ী যুবায়েরের নিকট দৌড়ে যান এবং বলেন : আমি ষাট হাজার দীনার দিয়ে একটি জমি কিনেছি, আর আলী রা. সেটার হস্তান্তর স্থগিত চেয়ে উসমান রা.-এর নিকট গিয়েছেন। জুবায়ের বললেন : এখানে আমি তোমার অংশীদার হতে চাই। এরপর উসমান রা.-এর নিকট গিয়ে বললেন : এ ক্রয়-বিক্রয়ে আমি অংশীদার রয়েছি। তখন উসমান রা. আলী রা.-কে বললেন : আমি কিভাবে নিষেধাজ্ঞা দিব যে কাজে যুবায়েরের মত অভিজ্ঞ লোক জড়িত আছে। এ উক্তি দ্বারা বুঝা যায়, যুবায়েরের মত অভিজ্ঞ লোক না থাকলে ক্রয়-বিক্রয় স্থগিত হয়ে যেত, কারণ অন্যজন নির্বোধ।[৫৯]

মাল গুদামজাত করার উপর নিষেধাজ্ঞা

উসমান রা. উমার রা.-এর মত সকল জিনিস গুদাম জাত করার উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের মতে, রাসূল সা.-এর নির্দেশ এখানে সাধারণ, তাই সকল পণ্য দ্রব্য এর অন্তর্ভুক্ত।[৬০]

---

৫৭. আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল ফী আহাদিসির রাসূল*, তাহকীক : আব্দুল কাদের আরানতু, অধ্যায় : তালাক, পরিচ্ছেদ : ফী তালাকিল মুকাররহি ওয়াল মাজনুন, মাকতাবাতু দারুল বায়ান, ১ম সং ১৯৭১, খ. ৭, পৃ. ২০৯

৫৮. আস-সাল্লাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৭

৫৯. ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, অধ্যায় : হিজর, পরিচ্ছেদ : আল-হিজর আলাল-বালিগীন বিস-সাফাহ, *প্রাগুক্ত*

৬০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৯

মৃত্যুকালীন অসুস্থতার সময় স্ত্রীকে তালাক দিলে সে উত্তরাধিকার পাবে

আব্দুর রহমান ইবন আওফ রা. অসুস্থ থাকা অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন, তথাপি উসমান রা. তাঁর ইদ্দত শেষ হলে তাকে সম্পদের উত্তরাধিকার করেন। যদিও এ ব্যাপারে কোন দলীল পাওয়া যায় না তথাপি উসমান রা. ইজতিহাদ করে এ রায় দিয়েছিলেন। তাঁর যুক্তি হলো, মৃত্যুকালীন অসুস্থতার পর স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার যুক্তিই হলো তাকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা, তাই তা কার্যকর হবে না।[৬১]

ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী উত্তরাধিকার পাবে

হাব্বান ইবন মুনকিয সুস্থ অবস্থায় তার স্ত্রীকে তালাক দেয়। তখন তার স্ত্রী তার কন্যাকে দুধপান করাচ্ছিল। আর দুধপান করানোর জন্য তার স্ত্রীর ঋতু বা হায়েয সতের মাস বন্ধ ছিল। আর হাব্বান তাকে তালাক দেওয়ার সাত অথবা আট মাস পরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন তাকে বলা হলো, তোমার স্ত্রী তোমার সম্পদের মালিকানা পাবে, তখন সে বললো, আমাকে উসমান রা.-এর নিকট নিয়ে যাও। লোকেরা তাকে উসমান রা.-এর নিকট নিয়ে গেল, এবং সে তখন তাঁর স্ত্রীর ঘটনা বর্ণনা করলো। সেখানে আলী ইবন আবি তালিব রা. ও যায়েদ ইবন সাবিত রা. উপস্থিত ছিলেন। উসমান রা. তাঁদের মতামত চাইলেন : তখন তারা বললো : হাব্বান মৃত্যুবরণ করলে তাঁর স্ত্রী উত্তরাধিকার পাবে। আর স্ত্রী মৃত্যুবরণ করলে স্বামীও উত্তরাধিকার পাবে। কেননা সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যার হায়েয হয় নাই। অতএব তাঁর ইদ্দত গণনা শুরু হবে তার হায়েয শুরু হওয়ার পর থেকে। সেটা অল্পদিন হোক আর বেশী দিন হোক। (অর্থাৎ সন্তানের ২৪ মাস দুধ খাওয়ানোর পর যেদিন থেকে হায়েয শুরু হবে, সেদিন থেকে ইদ্দত গণনা শুরু হবে।)

হাব্বান তার স্ত্রীর নিকট ফিরে গেল এবং মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে আসলো। দুধ খাওয়া বন্ধ হওয়ার কারণে তার স্ত্রী হায়েয ফিরে পেল। এরপর মহিলা পরের মাসের হায়েযের দেখা পেল। মহিলার তৃতীয় মাসের হায়েযের পূর্বেই তার স্বামী মৃত্যুবরণ করেন। তাই সে মহিলা সর্বশেষ বিধবা হিসেবে ইদ্দত পালন করলেন এবং হাব্বান ইবন মুনকিযের সম্পদের উত্তরাধিকারী হলেন।[৬২]

---

৬১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০০

৬২. ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, অধ্যায় : আল-'আদদ, অনুচ্ছেদ : ইদ্দাতুন মান তাবা'আদা হায়দুহা; প্রাগুক্ত, ইমাম মালিক, *মুয়াত্তা*, অধ্যায় : তারাক, পরিচ্ছেদ : আল-মার'আতু ইউতাল্লিকুহা ঝাওজাহা, *প্রাগুক্ত*

বেওয়ারিশ শিশুর উত্তরাধিকার প্রাপ্তি

একজন কাফির মহিলাকে কারাবন্দী করা হলো। তার কোলে সন্তান ছিল এবং সে দাবী করলো এটা তার পুত্র সন্তান। মাতৃত্ব বা পিতৃত্ব প্রমাণ না করতে পারলে ছেলে মায়ের বা মা ছেলের কেউ কারো উত্তরাধিকার হতে পারে না। উসমান রা. বিষয়টি নিয়ে সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করলেন। প্রত্যেকেই তাঁদের মতামত দেওয়ার পর উসমান রা. বললেন : আমরা আল্লাহর সম্পদ কাউকে প্রমাণ ছাড়া উত্তরাধিকার দিতে পারি না। এরপর বললেন : বেওয়ারিশ শিশু প্রমাণ ছাড়া উত্তরাধিকার পাবে না।[৬৩]

হারিয়ে যাওয়া উটের বিধান

উমার ইবন খাত্তাব রা.-এর সময়ে হারিয়ে যাওয়া উট ছেড়ে দেওয়া হতো। কেউ তাতে স্পর্শ পর্যন্ত করতো না। কিন্তু উসমান রা.-এর সময় তিনি নির্দেশ দেন যে, হারানো উটের ঘোষণা দিতে হবে। এরপর তা বিক্রি করা যাবে। পরবর্তীতে যদি মালিক পাওয়া যায়, তাহলে তাকে তার মূল্য আদায় করে দিতে হবে।[৬৪] ইমাম হাজাভী রহ.-এর মতে, এটা উসমান র.-এর নিছক গবেষণা (ইজতিহাদ)। তাঁর এ গবেষণার পক্ষে যুক্তিগুলো হলো-

১. পুরো ইজতিহাদটি আল-মাসলাহাতুল মুরসালাহ (জনস্বার্থে) ভিত্তিতে নেয়া হয়েছে।

২. উটটি নেকড়ে খেয়ে ফেলার থেকে কারো উপকারে আসা উত্তম।

৩. এ অবস্থায় উটটি ছেড়ে দিলে অন্যের ফসলের ক্ষতি হবে।

৪. প্রকৃত মালিক না থাকার কারণে উটটির স্বাস্থ্যের অবনতি হবে।[৬৫]

তাই এ অবস্থায় লালন-পালন করে উটটি বিক্রি করা বৈধ। তবে, অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ এখানে জনস্বার্থে এরূপ করার কোন সুযোগ নেই বলে মত দিয়েছেন।[৬৬]

---

৬৩. ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা,* অধ্যায় : সিয়ার, অনুচ্ছেদ : আল-হামিলু লা ইউরিছু ইজা উতিকা, প্রাগুক্ত

৬৪. ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা,* অধ্যায় : লুকতাতু, অনুচ্ছেদ : আর-রজুলু ইয়াজিদু দল-লাতুন;

৬৫. আস-সাল্লাবী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২০০

৬৬. *প্রাগুক্ত*

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, বিচার ব্যবস্থা ও ফিকহী ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তৃতীয় খলীফা উসমান রা.-এর অসামান্য অবদান রয়েছে। যার বর্ণনা ও মূল্যায়ন কোন সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে পূর্ববর্তী নবীদের ঘটনা ও আদর্শ থেকে উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও শিক্ষা গ্রহণ করার আহবান জানিয়েছেন। আল্লাহ বলেন-

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ﴾

> এরা এমন ছিল যাদেরকে আল্লাহ পথ-প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব আপনি তাঁদের পথ অনুসরণ করুন।[৬৭]

তাই আমাদের উচিত খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। বর্তমান বিশ্বের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা অন্যায়-অত্যাচারে ভরে যাচ্ছে। তাই এই সমাজ ও রাষ্ট্রকে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে উসমান রা.-এর বিচার ব্যবস্থা ও ফিকহী ইজতিহাদ আমাদের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে ভূমিকা পালন করবে।

---

৬৭. আল-কুরআন, ৬ : ৯০

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার নিয়মাবলি

(১) ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত রেজিঃ নং (DA-6000) বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর একটি ত্রৈমাসিক একাডেমিক রিসার্চ জার্নাল। এটি প্রতি তিন মাস অন্তর, (জানুয়ারী-মার্চ, এপ্রিল-জুন, জুলাই-সেপ্টেম্বর, অক্টোবর-ডিসেম্বর) নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

(২) এ জার্নালে ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা, শেয়ার ব্যবসা, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ফিক্হশাস্ত্র, ইসলামী আইন, মুসলিম শাসকদের বিচারব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিক্হী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধ স্থান পায়।

(৩) জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা রিভিউ করানো হয়। রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে তা প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।

(৪) জার্নালে সর্বোচ্চ ১৫০০ শব্দে গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টারি গ্রন্থ পর্যালোচনাও প্রকাশ করা হয়। এ ক্ষেত্রে ইসলামী আইন ও বিচার বিষয়ক গ্রন্থ অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

লেখকদের প্রতি নির্দেশনা

১. প্রবন্ধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সব বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়

ক. ইসলামী আইন ও বিচার সম্পর্কে জনমনে আগ্রহ/চাহিদা সৃষ্টি করা ও গণসচেতনতা তৈরি করা;

খ. ইসলামী আইন ও বিচার সম্পর্কে পুঞ্জিভূত বিভ্রান্তি দূর করা;

গ. মুসলিম শাসনামলের ইসলামী আইন ও বিচারের প্রায়োগিক চিত্র তুলে ধরা।

২. প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া

পাণ্ডুলিপি অবশ্যই লেখকের মৌলিক গবেষণা (Original Research) হতে হবে। প্রবন্ধ 'ইসলামী আইন ও বিচার'-এ জমা দেয়ার পূর্বে কোথাও কোনো আকারে বা ভাষায় প্রকাশিত বা একই সময়ে অন্যত্র প্রকাশের জন্য বিবেচনাধীন হতে পারবে না। এ শর্ত নিশ্চিত করার জন্যে প্রবন্ধের সাথে লেখককে/দের এ মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে যে,

(ক) জমাদানকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি/তারা;

(খ) প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোথাও কোনো আকারে বা ভাষায় মুদ্রিত/প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেয়া হয়নি;

(গ) এ জার্নালে প্রবন্ধটি প্রকাশ হওয়ার পর সম্পাদকের মতামত ব্যতীত অন্যত্র প্রকাশের জন্য জমা দেয়া হবে না;

(ঘ) প্রবন্ধে প্রকাশিত/বিবৃত তথ্য ও তত্ত্বের সকল দায়-দায়িত্ব লেখক/গবেষকগণ বহন করবেন। প্রতিষ্ঠান এবং জার্নালের সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ এর কোনো প্রকার দায়-দায়িত্ব বহন করবেন না।

৪. প্রেরিত প্রবন্ধের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় যা থাকতে হবে

লেখকের পূর্ণ নাম, প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি, ফোন/মোবাইল নাম্বার, ই-মেইল ও ডাক ঠিকানা।

৫. সারসংক্ষেপ

প্রবন্ধের শুরুতে ২০০-২৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) থাকতে হবে। এ সারসংক্ষেপে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, প্রবন্ধে ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফল সম্পর্কে ধারণা থাকবে।

৬. পাণ্ডুলিপি তৈরি

(ক) প্রবন্ধের শব্দসংখ্যা সর্বনিম্ন ৩০০০ (তিন হাজার) এবং সর্বোচ্চ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) হতে হবে।

(খ) পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে দুই কপি (হার্ড কপি) পত্রিকা অফিসে জমা দিতে হবে এবং প্রবন্ধের সফট কপি সেন্টার-এর ই-মেইল (e-mail) ঠিকানায় (islamiclaw_bd@yahoo.com) পাঠাতে হবে।

(গ) কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য বাংলা বিজয় কী-বোর্ড ব্যবহার করে (Microsoft Windows XP, Microsoft office 2000 এবং MS-Word- SutonnyMJ ফন্ট ব্যবহার করে ১৩ পয়েন্টে (ফন্ট সাইজ) পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে হবে। লাইন ও প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে ডবল স্পেস হবে।

(ঘ) A4 সাইজ কাগজে প্রতি পৃষ্ঠায় উপরে ২ ইঞ্চি, নিচে ২ ইঞ্চি, ডানে ১.৫ ইঞ্চি, বামে ১.৬ ইঞ্চি মার্জিন রাখতে হবে।

(ঙ) প্রবন্ধে ব্যবহৃত ইংরেজি উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে Times New Roman ফন্ট এবং আরবী উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে Simplified Arabic/Traditional Arabic ফন্ট ব্যবহার করতে হবে।

(চ) প্রবন্ধে ব্যবহৃত সকল তথ্যের পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক সূত্র (Primary Source) উল্লেখ করতে হবে।

(ছ) আল-কুরআন-এর TEXT অনুবাদসহ মূল প্রবন্ধে এবং হাদীসের আরবী TEXT প্রতি পৃষ্ঠার নিচে ফুটনোটে এবং অনুবাদ মূল লেখার সাথে দিতে হবে।

(জ) কুরআন ও হাদীসের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত অনুবাদ অনুসরণ করে চলিত রীতিতে রূপান্তর করতে হবে।

(ঝ) উদ্ধৃতি উল্লেখের ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থের (আরবী, উর্দু, ইংরেজি যে ভাষায় হোক তা অপরিবর্তিত রেখে) TEXT দিতে হবে। মাধ্যমিক সূত্র (Secondary Source) বর্জনীয়। কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতিতে অবশ্যই হরকত দিতে হবে।

(ঞ) প্রবন্ধ বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসরণে রচিত হতে হবে, তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

(ট) উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না, তবে লেখক কোনো বিশেষ বানান বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে।

(ঠ) তথ্যনির্দেশ ও টীকার জন্য শব্দের উপর অধিলিপিতে (Superscipt) সংখ্যা (যেমন : আল-ফিকহ[১]) ব্যবহার করতে হবে। তথ্যসূত্র সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার নিচে উল্লেখ করতে হবে।

(ড) মূল পাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি ৩০ শব্দের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উল্লেখ করতে হবে।

(ঢ) ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ দিতে হবে।

(ণ) হাদীস উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে রেফারেন্সে উদ্ধৃত হাদীসের সংক্ষিপ্ত তাহকীক, বিশেষ করে হাদীসটির শুদ্ধতা বা গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত মূল্যায়ন দিতে হবে। তাহকীক এর ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়মে সূত্র উল্লেখ করতে হবে।

(ত) প্রবন্ধে দলীল হিসাবে জাল/বানোয়াট হাদীস অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

তথ্যসূত্র যেভাবে উল্লেখ করতে হবে

(১) **কুরআন থেকে :** আল-কুরআন, ২ : ১৫।

(২) **হাদীস থেকে :** লেখক/সংকলকের নাম, গ্রন্থের নাম (ইটালিক হবে), অধ্যায় (ابواب-كتاب) : ..., পরিচ্ছেদ (باب) : ..., প্রকাশ স্থান : প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, প্রকাশকাল, খ....., পৃ....., হাদীস নং-...।
যেমন : ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আস-সালাত, অনুচ্ছেদ : আস-সালাতু ফিল-খিফাফ, আল-কাহেরা : দারুত তাকওয়া, ২০০১, খ. ১, পৃ. ১০৩, হাদীস নং-৩৭৫।

(৩) **অন্যান্য গ্রন্থ থেকে :** লেখকের নাম, গ্রন্থের নাম (ইটালিক হবে), প্রকাশ স্থান : প্রকাশনা সংস্থা, প্রকাশকাল, সংস্করণ নং (যদি থাকে), খ...., পৃ....।
যেমন : মোহাম্মদ আলী মনসুর, *বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১০, পৃ. ২১।

(৪) **জার্নাল/প্রবন্ধ থেকে :** প্রবন্ধকারের নাম, প্রবন্ধের শিরোনাম, জার্নালের নাম (ইটালিক হবে), প্রকাশনা সংস্থা/প্রতিষ্ঠান, বর্ষ : ..., সংখ্যা :..., (প্রকাশ কাল), পৃ.... ।
যেমন : ড. আ ক ম আবদুল কাদের, মদীনা সনদ : বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, বর্ষ : ৮, সংখ্যা : ৩১, জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১২, পৃ. ১৩।

(৫) **দৈনিক পত্রিকা থেকে**
নিবন্ধ থেকে হলে : লেখকের নাম, নিবন্ধের শিরোনাম, পত্রিকার নাম (ইটালিক হবে), তারিখ ও সাল, পৃ.... ।
যেমন : মোহাম্মদ আবদুল গফুর, রিমান্ডে দৈহিক নির্যাতনের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায় প্রসঙ্গ, *দৈনিক ইনকিলাব*, ৬ জুন, ২০১৩, পৃ. ১১।
রিপোর্ট বা অন্য কোনো তথ্য হলে : পত্রিকার নাম (ইটালিক), তারিখ ও সাল, পৃ... ।
যেমন : *দৈনিক ইনকিলাব*, ৬ জুন, ২০১৩, পৃ. ৬।

(৬) **ইন্টারনেট থেকে :** ইন্টারনেট থেকে তথ্য গ্রহণ করা হলে বিস্তারিত তথ্যসূত্র উল্লেখপূর্বক গ্রহণের তারিখ ও সময় উল্লেখ করতে হবে।
যেমন www : ilrcbd.org/islami_ain_o_bechar_article.php

অন্যান্য জ্ঞাতব্য

(১) প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেয়া হয় না।
(২) প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক/গণ জার্নালের ২ (দুই) কপি এবং প্রবন্ধের ৫ (পাঁচ) কপি অফপ্রিন্ট বিনামূল্যে পাবেন।
(৩) প্রকাশিত প্রবন্ধের ব্যাপারে কারো ভিন্নমত থাকলে এবং তা যুক্তিযুক্ত, প্রামাণ্য ও বস্তুনিষ্ঠ মনে করা হলে উক্ত সমালোচনা জার্নালে প্রকাশ করা হয়।
(৪) প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য প্রাথমিকভাবে গৃহিত হলে সম্পাদক ও রিভিউয়ারের নির্দেশনা অনুযায়ী লেখককে প্রবন্ধ সংশোধন করে পুনরায় জমা দিতে হবে, অন্যথায় তা প্রকাশ করা হবে না।
(৫) জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধের কপিরাইট সেন্টার সংরক্ষণ করবে। প্রবন্ধের লেখক তার প্রকাশিত প্রবন্ধ অন্য কোথাও প্রকাশ করতে চাইলে সম্পাদক-এর নিকট থেকে লিখিত অনুমতি নিতে হবে।
(৬) সম্পাদক/সম্পাদনা পরিষদ প্রবন্ধে যে কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিমার্জন করার অধিকার রাখেন।
(৭) জার্নালে প্রকাশের জন্য কোনো প্রবন্ধ প্রেরণের পূর্বে লেখার নিয়ম অনুসরণ পূর্বক তা সাজাতে হবে। অন্যথায় তা বাছাই পর্বেই বাদ যাবে।
(৮) প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য লেখককে কোনো সম্মানী প্রদান করা হয় না।

১. রিসার্চ প্রজেক্ট

ক. ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইন
খ. মুসলিম পারিবারিক আইন
গ. নারী, শিশু ও মানবাধিকার
ঘ. ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস
ঙ. ইসলামী আইন সম্পর্কে ভ্রান্তি নিরসন
চ. ইসলামী আইনের কল্যাণ ও কার্যকারিতা উপস্থাপন

২. লিগ্যাল এইড প্রজেক্ট

ক. পারিবারিক বিরোধ নিরসনে সালিশ
খ. আদালতের বাইরে সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি
গ. অসহায় মজলুমদের আইনী সহায়তা
ঘ. নির্যাতিতা নারী ও শিশুদের আইনী সহায়তা
ঙ. ইসলামের পক্ষে আইনী প্রতিরোধ

৩. সেমিনার প্রজেক্ট

ক. আন্তর্জাতিক আইন সেমিনার
খ. জাতীয় আইন সেমিনার
গ. মাসিক সেমিনার
ঘ. মতবিনিময় সভা
ঙ. গোল টেবিল বৈঠক

৪. জার্নাল প্রজেক্ট

ক. ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)
খ. ইসলামিক ল' এন্ড জুডিশিয়ারী (ষাণ্মাসিক)
গ. আরবী জার্নাল (ষাণ্মাসিক)
ঘ. মাসিক পত্রিকা
ঙ. বুলেটিন

৫. বুক পাবলিকেশন প্রজেক্ট

ক. মৌলিক আইন গ্রন্থ
খ. অনুবাদ আইন গ্রন্থ
গ. আইনের বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তিকা
ঘ. ইসলামী আইন কোড
ঙ. ইসলামী আইন বিশ্বকোষ

৬. লেখক প্রজেক্ট

ক. বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক লেখক ফোরাম
খ. আইনজীবী ভিত্তিক লেখক ফোরাম
ঘ. মাদরাসা ভিত্তিক লেখক ফোরাম
ঘ. লেখক ওয়ার্কশপ
ঙ. লেখক সম্মেলন

৭. লাইব্রেরী প্রজেক্ট

ক. কুরআন-হাদীস ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ
খ. ফিক্হ ভিত্তিক ডকুমেন্টারী বই/কিতাব সংগ্রহ
গ. আইন ভিত্তিক ডকুমেন্টারী বই/কিতাব সংগ্রহ
ঘ. ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ
ঙ. ইসলামের ইতিহাস ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ

৮. উন্নয়ন প্রজেক্ট

ক. আইন কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা
খ. আইন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা
গ. আধুনিক অডিটোরিয়াম প্রতিষ্ঠা
ঘ. ই-লাইব্রেরী
ঙ. আইন ওয়েব সাইট

ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার

গ্রাহক/এজেন্ট ফরম

আমি 'ইসলামী আইন ও বিচার'-এর গ্রাহক/এজেন্ট হতে চাই। আমার ঠিকানায় ....কপি পাঠানোর অনুরোধ করছি।

নাম ঃ..

ঠিকানা ঃ ....

....

বয়স .... পেশা...

ফোন/মোবাইল ঃ ....সহজলভ্য মাধ্যম ঃ

ডাক/কুরিয়ার : ফরমের সঙ্গে ....টাকা সংস্থার নামে মানি অর্ডার/টিটি/ডিডি করলাম/অথবা নিম্নলিখিত ব্যাংক একাউন্টে জমা দিলাম।

কথায় টাকা ....

স্বাক্ষর

গ্রাহক/এজেন্ট

ফরমটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে

সম্পাদক

ইসলামী আইন ও বিচার

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

৫৫/বি, নোয়াখালী টাওয়ার (স্যুট-১৩/বি), পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭, ০১৭১৭-২২০৪৯৮

E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com. www.ilrcbd.org

সংস্থার একাউন্ট নং

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

MSA-11051 ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, পল্টন শাখা, ঢাকা

ভি.পি ও কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়।

ডাক বা কুরিয়ার চার্জ সংস্থা বহন করে।

এজেন্ট হওয়ার জন্য ৫ কপির অর্ধেক মূল্য অগ্রিম পাঠাতে হবে।

গ্রাহক হওয়ার জন্য ন্যূনতম এক বছর তথা ৪ সংখ্যার মূল্য বাবদ ৪০০/- টাকা অগ্রিম পাঠাতে হয়।

৫ কপির কমে এজেন্ট করা হয় না। ৫ কপি থেকে ২০ কপি পর্যন্ত ২০% কমিশন

২০ কপির উর্ধ্বে ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

➪ ১ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(চার সংখ্যা) = ১০০ X ৪ = ৪০০/-

➪ ২ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(আট সংখ্যা) = ১০০ X ৮ = ৮০০/-

➪ ৩ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(বার সংখ্যা) = ১০০ X ১২ = ১২০০/-